

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

জীবন্ত ধর্মে যুগ-ইমাম

শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় :
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল - ১৪১২
বৈশাখ - ১৩৯৯
এপ্রিল - ১৯৯২

তৃতীয় মুদ্রণ :
লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

রমজান - ১৪২২
অগ্রহায়ণ - ১৪০৮
ডিসেম্বর - ২০০১

মুদ্রণে : বিকাশ মুদ্রণ
১১/৪, টয়েনবি সার্কুলার রোড
ঢাকা-১০০০।

JIBANTA DHARME JUGA IMAM
Shah Mustafizur Rahman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তয় সংক্ষরণের ভূমিকা

আল্লাহত্তাআলার মনোনীত ধর্ম 'ইসলাম'। এ ধর্ম বিশ্ব ধর্ম, সার্বজনীন ধর্ম ও জীবন ধর্ম। এ যামানায় ইসলামের সৌন্দর্য ও আদর্শ প্রচারের জন্য আল্লাহ পাকের ওয়াদা ও রসূলে করীম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুগের ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ত্ব হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। পৃথিবীর কোথে কোথে প্রতি ঘরে ঘরে ইসলামের সওগাত পৌছে দিতে এ জামাত সর্বাঙ্গক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে 'তবলীগ' বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবলীগের কার্যকারিতা ও এর শুরুত্ত উপলক্ষ্য করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার এর মধ্যে একটি। তবলীগের জন্য একাপ অগণিত পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করা হচ্ছে। এতে তবলীগের কাজ সহজে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ-এর উপরে শুরুত্ত আরোপ করে একটি উর্দ্ধ পুস্তকের বাংলা তরজমা সহ কয়েকটি পুস্তকের পুনঃ মুদ্রণ করেছে। পুস্তকগুলো হল আদর্শ জননী, রাহে ইমান, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী সমূহ, উম্মতি নবী এবং এখন 'জীবন ধর্মে যুগ-ইমাম' বইটির তয় সংক্ষরণ প্রকাশ করেছে। এ বইটি তবলীগের জন্য বিশেষ সহায়ক এবং এর চাহিদার প্রতি শুরুত্ত আরোপ করে বইটি পুনঃ প্রকাশের জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ গত ৭ম মজলিসে শূরা ২০০০ইং সালে গৃহীত প্রস্তাব হযরত আকদস খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বিদ্যমতে পেশ করে। হ্যুব আকদস (আইঃ) সেই প্রস্তাবের সদর অনুমোদন দান করেছেন। আল্লাহমদুল্লাহ।

এই তয় সংক্ষরণ প্রকাশের জন্য সার্বিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মিসেস আনোয়ারা বেগম, নায়েব সদর-২ ও সেক্রেটারী তবলীগ লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ। প্রকাশনার কাজে সহযোগিতা করেছেন মিসেস হসনে আরা ভাসান্দক, সেক্রেটারী ইশায়াত। আল্লাহত্তাআলা ভাদেরকে উত্তম পূরক্ষারে ভূষিত করুন। সবশেষে কামনা করি ইসলামের তবলীগের ক্ষেত্রে আমাদের সবার সকল প্রচেষ্টা ও কোরবানী আল্লাহ রাকুন আলামিন কবুল করে নিয়ে বরকত দান করুন, আমীন।

খাকসার

শাকসুন্দা রহমান

সদর

লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ

তারিখ : ঢাকা

২৬ ডিসেম্বর, ২০০১ইং

বিশ্বাস করেন যে এই পুরুষের মৃত্যুটি কোনো দেশের কাছে হয়েছে না। তার মৃত্যুর কাছে আর কোনো দেশের কাছে হয়েছে না। এই পুরুষের মৃত্যুটি কোনো দেশের কাছে হয়েছে না।

জীবন্ত ধর্মে যুগ-ইমাম

ভূমিকা

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস একদিকে যেমন দৃঃখ ও গ্লানির ইতিহাস, ব্যর্থতা ও বিজিতের ইতিহাস; অপরদিকে তেমনি সংগ্রামেরও ইতিহাস, হতরাজ্য ও গৌরব পুণরুদ্ধারের যুদ্ধের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে দখলের সাথে সাথে ব্রিটিশরা চেয়েছিল এদেশের সকল ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে জয় করতে। এবং সেই লক্ষ্যেই সংগ্রাম করে চলেছিল তাদের পাদ্রীরা ও পণ্ডিতরা। এই সংগ্রামে তারা সফলতা অর্জন করে অগ্রসরও হচ্ছিল ক্রমাগত। পাদ্রীদের লক্ষ্যস্থল ছিল প্রধানতঃ মুসলমান এবং ম্যাঝম্যুলারের মত পণ্ডিতদের লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দু ও অন্যরা। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক এই আক্রমণের মুখ্য নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে হিন্দুদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধর্মান্দোলন যেমন, সনাতন ধর্ম, আর্য সমাজী, বাঙ্গ সমাজী প্রভৃতি। কিন্তু তখনও মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ কোন ধর্মান্দোলন গড়ে উঠেনি। বরং পাদ্রীদের কাছে পরাভূত হয়ে মুসলমানদের বড় বড় আলেমও খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছিল। এবং অন্যান্য আলেমরা তাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দিয়েই ক্ষতি থাকতেন। না তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতেন, না খৃষ্টান আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করতেন।

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত কালটাই ছিল মুসলমানদের জন্য এক মহাদুর্যোগের কাল। তখন একদিকে তারা রাজহারা হয়েছে অপরদিকে তারা ধর্মহারা হচ্ছিল। এই শোচনীয়

অবস্থায় তাদেরকে সহায়তা করার জন্য কেউ ছিল না, না ভারতবর্ষে, না সমগ্র মুসলিম জাহানে। কারণ, সর্বত্রই চলছিল খৃষ্টান রাজত্বের ও প্রতাপের জয় জয়াকার। মুসলমানদের এই হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে ১৮৮৯ সালে হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ঐশ্বী নির্দেশে ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই আন্দোলনের জনৈক বিরুদ্ধবাদী লিখেছেনঃ

“আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর সময়কালটা অনন্য শুরুত্ববহু। বিশেষ করে এটাই সেই শতাব্দী যখন মুসলিম জাহানে বৃদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতা ও টানাপোড়েন চরমে পৌছেছিল। হিন্দুস্থান ছিল এইরূপ অস্থিরতা ও উভেজনার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কৃষ্ণ-কালচারের টানাপোড়েন; পুরাতন ও নতুন শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; প্রাচীন ও নবীন বিশ্বের মতাদর্শ এবং ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠেছিল। এবং উভয় শক্তি উভরণের জন্য ঘোরতর সংগ্রামে লিঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

‘আন্দোলনের দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়ে পড়ে তখন যখন ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরাভূত হয়ে যায়। এই পরাজয় মুসলমানদেরকে মর্মাহত করে ফেলে, তাদের হস্তয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, তাদের চিন্তা-চেতনা অসাড় হয়ে পড়ে। তারা বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল দৈত দাসত্বেরঃ রাজনৈতিক-এবং সাংস্কৃতিক। একদিকে, বিজয়ী শক্তি বিটীশ সারা ভারতবর্ষে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য দূর্ব্লাপ্ত অভিযান শুরু করে দিয়েছিল; অপরদিকে, খৃষ্টান মিশনারীরা, যারা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের খৃষ্টধর্মে অন্যদেরকে ধর্মান্তরিত করার কাজে উত্তরোত্তর তৎপরতা বৃদ্ধি করে চলেছিল,—তাদের প্রধান টাগেট ছিল সেই নতুন প্রজন্মের মুসলমানরা। ক্ষুল কলেজগুলো ছিল তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র, যেখানে তারা লিঙ্গ থাকতো বৃদ্ধিবৃত্তিক বিভাসি ছড়াবার কাজে। তারতে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, এই সময়ে আসল বিপদ যা দেখা দিয়েছিল তা মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাওয়া নয়, বরং তা ছিল সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা।

‘এটা ছিল পরিস্থিতির একদিক : এই পরিস্থিতি ছিল বাইরের বিপদ। আভ্যন্তরীণভাবে,-পরিস্থিতি ছিল আরো শোচনীয়। মুসলিম ফের্কাণ্ডোর মধ্যেকার পারম্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত তখন ভয়াবহ অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল। প্রতিটি ফের্কাই অপর সব ফের্কাণ্ডোকে বাতিল সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ফের্কাগত ফেন্না-ফাসাদ তখন নিয়ন্ত্রণিতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে, এ সব ফেন্না-কলহ প্রায়শঃ রক্তাক্ত দাঙ্গায় রূপ নিত। গোটা হিন্দুস্থানেই তখন ফের্কাগত দাঙ্গা-হঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অবস্থাটা এক প্রকার মানসিক বিভ্রান্তিরও জন্ম দিয়েছিল, এবং তা মুসলিম সমাজকে টুকরো টুকরো করছিল, বিত্তী সৃষ্টি করছিল জনসাধারণের মধ্যে যা আলেমদের তথা ইসলামের মর্যাদাকে বহুলাংশে খর্ব করেছিল। অপরদিকে,-আনাড়ী সুফীরা বা পীর ফকিররা এবং আধ্যাত্মিকতায় অঙ্গ ভগু লোকেরা সুফী মতবাদকে খেলার বস্তুতে পরিণত করেছিল। পরিণাম দাঁড়িয়েছিল এই যে, মুসলিম জনগণের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল বাতেনী বিষয়াদির প্রতি একপ্রকার আজগুবী আকর্ষণ যার পূর্ণ সম্মতিকার করছিল ভগু দরবেশরা এবং ধর্মের ধূর্ত ব্যবসায়ীরা।-----

‘সাধারণভাবে, মুসলমানরা নৈরাশ্যে নিপত্তি হয়েছিল, তারা পরাজিত মনোভাবের শিকারে পরিণত হয়েছিল। তারা এ-ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিল যে, সহজ বা সাধারণ কোন উপায়ে আর কোন পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন সম্ভবপ্র নয়। তাই, বহুলোক অপেক্ষা করছিল কোন ঐশ্বী মনোনীত ইমামের আবির্ভাবের।

এটাই সেই সময় যখন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, মির্যা গোলাম আহমদ দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন তাঁর অনন্য বাণী ও আন্দোলন নিয়ে।”-----
(-এ- এইচ- নদবীঃ কাদিয়ানিজম এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি পৃঃ ৩-৬; ২৫, ২৬)।

মৌলানা মুহাম্মদ শরীফ ‘মনশূর মোহাম্মদী’তে (বাঞ্ছালোর) লিখেছেন :

‘চতুর্দিক থেকে ইসলামের উপর আক্রমণ চলছিল। নাস্তিকতা প্রসার লাভ করছিল। ধর্মহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাঙ্গা সমাজের লোকেরা তাদের দার্শনিক রচনাবলীর মাধ্যমে নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিল ইসলামের উপরে তাদের ধর্মত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। খৃষ্টান ভাতৃবৃন্দ তাদের যাবতীয় তৎপরতা নিয়োজিত করেছিল ইসলামের উৎখাতের জন্য। তারা এই হিসেবে উপনীত হয়েছিল যে, যতদিন ইসলামের সূর্য পৃথিবীতে আলো ছড়াতে থাকবে, ততদিন খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং ত্রিভুবন কোন প্রকারেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এক কথায়, সকল ধর্মের অনুসারীরাই ইসলামের প্রদীপ নির্বাপিত করার জন্য উঠে পড়ে গেগেছিল। আমরা বহুদিন যাবৎ দারুণভাবে উদ্বিঘ ছিলাম যে, মুসলিম আলেমদের মধ্য থেকে কেউ একজন আল্লাহু কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ধর্মের সমর্থনে ও রক্ষাকল্পে দণ্ডায়মান হউন। তিনি এমন এক গ্রন্থ রচনা করুন যা সময়ের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তিনি যুক্তি-তর্ক দ্বারা, দলীল ও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করুন যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহুর কালাম এবং হযরত রসূলে পাক (সা:) আল্লাহুর সত্য নবী।

‘আমরা আল্লাহুর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে, আমাদের সেই প্রত্যাশা অবশ্যে পূর্ণ হয়েছে। এইতো সেই গ্রন্থ যার প্রণয়নের প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা এতকাল। এর শিরোনাম ‘বারাহীন-এ-আহমদীয়া’। এতে গ্রন্থকার তিনশত অবিসংবাদিত দলীল ও প্রমাণ পেশ করেছেন পবিত্র কোরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওতের সত্যতার স্বপক্ষে। এই গ্রন্থের প্রণেতা আলেমকুলের শিরোমণি, সিদ্ধ ও সার্থক বিশেষজ্ঞ। তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের গৌরব, সর্বশক্তিমান আল্লাহুর এক পছন্দকৃত ও মনোনীত বান্দা। তিনি ‘চীফ অব কাদিয়ান’ মৌলবী মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। সকল প্রশংসা আল্লাহুর। কী বিশ্বয়কর এই রচনা যার প্রতিটি শব্দ ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করে, মুহাম্মদ (সা:) এর সত্যতা সাব্যস্ত করে।-----এই গ্রন্থ ঈমানের আয়না এবং কোরআন দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ।’

তাঁর ওফাতের পর ‘সাদাক আল আখবার’ (সেপ্টেম্বর ১১, ১৯০৮) লিখেছিল : ‘(তিনি) ইসলামের সমালোচকদেরকে চিরতরে শক্ত করে দিয়েছেন।’

চৌধুরী এ. এইচ ‘ফিনা ইর্তাদ’-এ লিখেছেন : ‘তিনি তাঁর চতুর্দিকের অনুসারীবৃন্দের মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করেছেন এবং ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের অন্তরে ধর্মপ্রচারের জন্য এক মহৎ প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা কিনা সকল মুসলিম ফের্কার জন্যই এক দৃষ্টান্ত। না, শধু তা-ই নয়, বরং তা দুনিয়ার সকল মিশনারী সংগঠনের জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ’। (দ্রঃ-Ahmadiyyat or Qadianism : Islam or Apostasy?—Naeem Osman Memon)

ভারতবর্ষের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা ও আলেম মৌলানা আবুল কালাম আযাদ লিখেছেন :

‘তিনি এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখা ও কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মণ্ডিক ছিল মৃত্তিমান বিশয়। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয়-স্বরূপ এবং কঠস্বর কেয়ামত সদৃশ। তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব সংঘটিত হতো। তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ ধর্মজগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয়-বিষাণ হয়ে নির্দিতগণকে জাগ্রত করতেন। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায়গ্রহণকরেছেন।

‘ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি যেরূপ বিজয়ী জেনারেশের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে আমরা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে মহান আন্দোলন আমাদের শক্রগণকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত করে রেখেছিল তা যেন ভবিষ্যতেও জারি থাকে।’—‘উকিল’ (অমৃতসর) জুন ২০, ১৯০৮।

এক কথায়, এই যুগে আল্লাহর আদেশের অনুবর্তিতায় উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকে যে মহাপুরুষ ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের মুখ

চিরতরে বঙ্গ করে দিয়েছেন; যিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত- স্থানীয় মিশনারী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এবং যে আন্দোলনের কর্ম তৎপরতা ও সাফল্য শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, শত জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে প্রতিদিন প্রতিঘন্টায় পৃথিবীর দেশে দেশে প্রসারিত হয়ে চলেছে, ইসলামের সেই আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংক্ষেপে পরিবেশন করেছেন লেখক এই ‘জীবন্ত ধর্মে যুগ-ইমাম’ পুস্তকে।

সুধী পাঠক ও পাঠিকা নিরপেক্ষ মন নিয়ে পুস্তকটি পাঠ করবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা এবং সন্নির্বন্ধ অনুরোধ। আল্লাহ পাক দয়া করে আমাদের সবাইকে সত্য সন্তান করবার ও গ্রহণ করবার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পুস্তকটিতে কোন বিচুতি গোচরীভূত হলে আল্লাহ চায় তো পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে।

পুস্তকটির প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং সবাইকে আল্লাহ উক্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমিন।

৪, বকশীবাজার রোড,

ঢাকা-১২১১

বৈশাখ, ১৩৯৯

এপ্রিল, ১৯৯২

খাকছার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

শতাব্দীর মুজাহিদ : যামানার ইমাম

যুগ-ইমামের আগমন ধর্মের জীবন্ত থাকার অকাট্য প্রমাণ। এশী ইমাম-হারা ধর্ম কালের প্রবাহে একদিন লোকায়ত দর্শনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ধর্ম তখন প্রাণহীন কেছা ও কাহিনী সর্বৰ হয়ে দাঢ়ায়। তাই--

সাইয়েদনাু মুহাম্মদুৱ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহোতায়ালা আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ طَلَذَةً الْأَمْمَةَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مَاءِقَةٍ سَنَةً مَّا تُبْعَثُ لَهَا دُيْنَاهَا -

(ابو ذاؤد-كتاب المهدى) - مشكوة - بكتاب العلم ص ۳

“নিচয় আল্লাহ প্রতি শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষকে আবিষ্ট করবেন যিনি ধর্মকে তাদের জন্য সংক্ষার করবেন” (আবু দাউদ : কিতাবুল মাহদী; মিশকাতঃ কিতাবুল ইল্ম)।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহর ইচ্ছায় আগমনকারী মুজাহিদ বা ধর্ম সংক্ষারককে ‘যুগ-ইমাম’ বা ইমামজামান হিসেবে মনোনীত করেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। এইরূপ মনোনয়ন প্রাপ্তির পর তিনি আল্লাহর আদেশের অধীনে খাঁটি ইসলামের দিকে আহ্বান জানান মানবমণ্ডলীকে। তিনি আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হন এবং তিনি তাঁর সেই প্রত্যাদিষ্ট ইওয়ার কথা ঘোষণা করেন জনসমক্ষে।

ইমামজামান বা ‘যুগ-ইমাম’ একটি পবিত্র উপাধি এবং এর পরিধি ব্যাপক। কারণ, এটি নবী-রসূল, মুজাহিদ, মুহাম্মদস সকলের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যাঁরা মানব জাতির সংশোধন, পথ-প্রদর্শন বা হেদায়াতের জন্য আদিষ্ট হন না, তাঁরা ওলী আবদাল হলেও ‘যুগ-ইমাম’ হতে পারেন না। কেননা, যুগ-ইমামতের বা নেতৃত্বের দায়িত্ব কোন অর্জিত বিষয় নয়, - অর্পিত বিষয়। আর তা খোদাতায়ালা কর্তৃক অর্পিত। এজন্যই আদিষ্ট মাঝুর

মিনাল্লাহ) না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেমন নবুওয়ত বা রেসালাতের দাবী পেশ করতে পারেন না; তেমনি যুগ-ইমামতের দাবীও পেশ করতে পারেন না। করলে সেই ব্যক্তি ভঙ্গ ও প্রতারক বলে প্রমাণিত হয় এবং আখেরে সে এবং তার অনুসারীরা (যদি কেউ থাকেও) খৎসপ্রাণ হয়। ঐরূপ ব্যক্তির ধর্মসাধন অন্য কাউকে করতে হয় না, করেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। এইরূপ শান্তি দান আল্লাহর এক প্রকার বিশেষ এখতিয়ার বা প্রেরোগেটিভ। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَلَا خَدْنَا مِنْهُ بِالْيَسِينِ
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ قُنْ أَحَدٍ عَنْهُ حِزْرِينَ ④

“এবং সে যদি কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধূত করিতাম, অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম, তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাঁর (আয়াব) হতে তাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।”

(৬৯ : ৪৫-৪৮)

কোরআন মজীদে আল্লাহতায়ালা এই দ্ব্যুথীন ও অব্যর্থ ঘোষণা দিয়েছেন হ্যরত রসূলে পাক (সা:)—এর সত্যতা প্রমাণের জন্য। এই ঐশী ঘোষণা যেমন নবী রসূলগণের জন্যে নির্দিষ্ট তেমনি তা প্রযোজ্য যুগ-ইমামগণের জন্যও। এবং এটি আল্লাহর একটি চিরস্তন নীতি বা সুরুত। তাই দেখা যায় বাইবেলেও বলা হয়েছিলঃ

“কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিন্তু অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।” (বিব-১৪: ২০)

মোদ্দা কথা, মানুষের হেদায়াতের জন্য মনোনীত ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হন। তা তিনি নবীই হোন, আর যামানার ইমামই হোন। আল্লাহ তাঁকে এইরূপ ঘোষণা করতে বলেনঃ

“তুমি বল, ‘নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি’”
(৩৯ : ১২)

“---এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হয়েছি; এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের
মধ্যে সর্বপ্রথম।” (৬ : ১৬৪)

“---তুমি বল, ‘নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি তাদের মধ্যে প্রথম
হই যারা আত্মসমর্পণ করে।’ এবং তুমি আদৌ মোশেরেকদের অস্তর্ভুক্ত হইও
না।” (৬ : ১৫)

“---এবং আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি মো’মেনগণের
অস্তর্ভুক্ত হই।” (১০ : ১০৫)- ইত্যাদি।

আল্লাহ কর্তৃক মনোনয়নের জন্য নবী রসূলগণের প্রতি আল্লাহর আদেশ
অবতীর্ণ হওয়ার এই ঐশী ধারার অনুবর্তনেই আদেশ অবতীর্ণ হয় যামানার
জন্য মনোনীত ইমামের প্রতিও। যেমন বর্তমান কালের যুগ-ইমামের প্রতিও
অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর এই আদেশঃ

قُلْ إِنِّي أُصَرِّتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

‘বল আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি (এই বিষয়ে) বিশ্বাস স্থাপন-
কারীদের মধ্যে প্রথম।’ খোদাতায়ালার মনোনীত এইরূপ মুজাদ্দিদ স্থীয়
যামানার ইমাম বা ইমামুজ্জামান। সমকালীন সকল মানুষের মধ্যে আল্লাহর
সঙ্গে সর্বাধিক প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপন হয় তাঁরই। তিনি আল্লাহর বাণী বা ওহী-
ইলহাম প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনার জবাব দান করেন। তাঁর প্রার্থনাসমূহ
মঞ্জুর করেন। তাঁর প্রতি নির্দশন প্রকাশ করেন। বার বার করেন। এইভাবে
আল্লাহতায়ালার সাথে তাঁর যেমন গভীর যোগাযোগ সাধিত হয়, তেমনি তাঁর
একনিষ্ঠ ও আত্মাগী অনুসারীবৃন্দেরও সৌভাগ্য হয় আল্লাহর সঙ্গে
যোগাযোগ স্থাপনের। বলা বাহ্য, এইরূপ যোগাযোগের বদৌলতেই মানুষ
আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব ও তাঁর শুণাবলী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে সমর্থ
হয়। অন্যথায়, শোনা কথার বিশ্বাসের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাপ্তরেই বিচরণ করে

মানুষের আল্লাহ সম্পর্কিত অভিজ্ঞান। মানবচিত্ত তখন সংশয়াপন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহকে এক কর্তৃত সত্তা বা লৌকিক অস্তিত্ব বলে ধারণা করে; এবং পরিণামে এ বিষয়ে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে নাস্তিকতার অভিশাপের প্রতি ধাবিত হয়। এই অবস্থা ব্যাপক ও গুরুতর হলে আল্লাহ তাঁর অসীম কর্মণায় মানুষের জন্য মানুষের মধ্য থেকে নবীর আবির্ভাব ঘটান। অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক ও কম গুরুতর থাকলে আল্লাহ সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। তাই হ্যরত রসুলে পাক (সা:)—এর ঐ আশীসত্তরা ভবিষ্যদ্বাণীর পুর্ণতার পবিত্র নহর ইসলামী জীবনের প্রান্তরে প্রান্তরে চিরদিন প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই পুণ্যধারায় প্রতি শতাব্দীতে আগমনকারী মহান ধর্মসংস্কারক বা মুজাদ্দিদগণের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের শত কাহিনী ইসলামের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

দূর্ভাগ্যজনক হলেও একথা অনন্ধিকার্য যে, পবিত্র এই মুজাদ্দিদগণের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই চরম বিরোধিতা চালিয়েছেন সমসাময়িক শাসকরা এবং ‘তাদের আলেমরা’। কিন্তু তাদের সেই স্বার্থসংকূতা ও অভ্যর্থনার সকল জুলুমকে হাসিমুখে বরণ করে এই মহামানবগণ অন্য সব মানুষের সঙ্গে তাদেরও পরিত্রাণের পথ খুলে দিয়েছেন যুগে যুগে।

যুগোপযোগী ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে ঐশী মনোনীত পুরুষের আগমনের এই পদ্ধতি এবং তার ধারাবাহিকতা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্মে নেই। অন্য কোন ধর্মের কোন মানুষ এই দাবী করতে পারবে না যে, তার ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন মহাপুরুষের আগমন ঘটে এসেছে যিনি বা যাঁরা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী পেশ করেছেন এবং সেই দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে ঐশী নির্দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এইরূপ দাবী হিন্দুতে করতে পারবে না, ইহুদীতে করতে পারবে না, বৌদ্ধ করতে পারবে না, খৃষ্টানে করতে পারবে না,—এক কথায় কোন ধর্মাবলম্বীই ঐ দাবী করতে পারবে না, একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া। একমাত্র মুসলমানই শুধু এই দাবী করতে পারে যে, প্রতি শতাব্দীতে অন্ততঃ একজন হলেও আল্লাহ তাঁর

মনোনীত ধর্মের এক মনোনীত বান্দার সাথে কথা বলেছেন, তার প্রার্থনার জবাব দান করেছেন, তার দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে নির্দশন প্রকাশিত করেছেন, তাকে মানুষের জন্য খাড়া করেছেন প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারকরণে। অদ্যাবধি প্রতি শতাব্দীতে এই ধারায় ঐশ্বী সংস্কারকগণের আবির্ভাবই ইসলামের জীবন্ত ধর্ম হওয়ার ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক প্রমাণ। এবং এই সেই ঐশ্বী প্রমাণ যার প্রকাশ্য ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীই করা আছে উল্লিখিত হাদীসে।

কোরআন করীমকে আক্ষরিকভাবে এবং তার পবিত্র শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে সকল প্রকারের প্রক্ষেপ থেকে, ভাস্তি ও বক্রতা থেকে সদা মুক্ত রাখার ও হেফাজত করার দায়িত্ব নিজের উপরেই রেখেছেন আল্লাহতায়ালা। এবং বলেছেনঃ ‘নিশ্চয়ই আমরা এই যিকর (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর হেফাজতকারী’ --(১৫:১০)।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহতায়ালার এই পবিত্র এরাদার একদিকে আছেন আক্ষরিক হেফাজতের নিমিত্তে কোরআনের শুন্দেয় হাফেজগণ, অপর দিকে অর্থ ও মর্মের হেফাজতের নিমিত্তে যামানার ইমাম বা মুজাদ্দিদগণ। উভয়ে মুহাম্মাদীয়ার লক্ষ লক্ষ হাফেজ-এ-কোরআন যেমন কোরআন মজীদকে ধ্বনি ও ভাষাগতভাবে অক্ষুণ্ণ রাখবার গুরুত্বার বহন করে চলেছেন, তেমনি এই সর্বশ্রেষ্ঠ উভয়ের অবশ্যমান্য মুজাদ্দিদগণ প্রতি শতকের মাথায় মাথায় আবির্ভূত হয়ে কোরআন করীমের আভ্যন্তরীণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাসমূহ ও তার সৌন্দর্যকে ভাস্তিমুক্ত ও নির্মল রাখবার গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করে আসছেন। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ--এই উভয় প্রকারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহতায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে বরাবর সমান্তরালভাবে সুস্পর্শ হয়ে আসছে বিরতিহীনভাবে। ইসলামী ইতিহাসে এমন কোন শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যায়নি, যে শতাব্দীতে হাজার হাজার কোরআনের হাফেজ ছিলেন না, তদুপর এমন কোন শতাব্দী যায়নি যখন কোন মুজাদ্দিদ বা ইমামমুজ্জামান ছিলেন না।

হ্যরত রসূলে পাক (সাৎ) বলেছেন :

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ رَمَانَهُ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -

(مسند أمام أحمد بن حنبل)

“যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না চিনে মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।” (মুসনাদ : আহমদ বিন হাসল)।

আহরত (সাৎ) আরও বলেছেন :

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً - (صحيف مسلم)

“যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার ক্ষেত্রে যুগ-ইমামের বায়আত থাকে না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে”। (সহিত মুসলিম)।

হাদীসের এই বাণী যে কোন ধর্মভীরুম মানুষের হৃদয়কে ‘যুগ-ইমাম’ এর অনুসন্ধানে ধাবিত করতে যথেষ্ট। কেননা, জাহেলিয়াতের মৃত্যু এরপ এক লাঞ্ছনিক দৰ্তাগ্রের সমষ্টি যে, কোন প্রকারের অশুভ ও অঙ্গুলই এর গভীর বাইরে নয়। অতএব নবী করীম (সাৎ)-এর এই অতি জরুরী অহিত-বাণী অনুসারে প্রত্যেক সত্যাবেষী ব্যক্তির জন্য প্রকৃত যুগ-ইমাম বা ইমামুজ্জামানের অনুসন্ধানে তৎপর থাকা একান্ত আবশ্যক।

উপরে উল্লেখিত হাদীসে ব্যবহৃত “আরাফা” শব্দটি এই ইঁগিত দান করে যে, যুগ-ইমামকে ‘চিনে নিতে হবে’। অতএব যুগ-ইমাম জনগণের নির্বাচিত কোন ইমাম বা নেতা নন। তাঁকে মনোনীত করেন স্বয়ং আল্লাহ। এবং ‘আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট’ (মামুর মিনাল্লাহ) হয়েই তিনি ডাক দেন আল্লাহর দিকে। তার পক্ষে ‘আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট’ হওয়ার দাবী থাকা জরুরী। দাবী না করলে হাদীস অনুযায়ী কারো পক্ষে নিজ ক্ষেত্রে বায়আতের জৌয়াল বহন করা কিরণে সম্ভব হবে? দাবী না থাকলে তো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী বিভিন্ন লোককে মুজাদাদিয়াতের আসনে বসাবে এবং সে অবস্থায় উপরের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও ফাসাদের দুয়ার খুলে যাবে। দাবী থাকা এবং

দাবীকাৰককে চিনে তাৰ হাতে বায়আত কৱাই হল শৃঙ্খলা প্ৰতিষ্ঠা কৱা, যা কিনা কলহ ফাসাদ দূৰীভূত কৱাৰ একমাত্ৰ উপায়। তাই আমৱা দেখতে পাই যে, যামানাৰ ইমাম মুজান্দিদগণেৰ মধ্যে যাদেৱ জীবনী সংৰক্ষিত আছে তাদেৱ দাবীও সংৰক্ষিত আছে। যেমন,—

(১) হযৱত ইমামে রাবানী মুজান্দিদ আলকে সানীৱ (ৱহঃ) ‘মকতুবাতে ইমাম রাবানী’তে (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪) আছে :

‘এই সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানেৰ অধিকাৰী এই একাদশ শতাব্দীৰ মুজান্দিদ।’

(২) হযৱত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (ৱাঃ) বলেছেনঃ

‘আল্লাহআমাকে মুজান্দাদিয়াতেৱ পোষাক পৱিয়েছেন।’

--(তাৰফহীমাতে ইলাহিয়া)।

(৩) হযৱত ইমাম জালালুদ্দীন সযুতী (ৱাঃ) বলেছেনঃ

‘আমি মুজান্দিদ’ইত্যাদি।

কোৱান কৱীমে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مَنْ كُنُّ

“ তোমৱা আনুগত্য কৱ আল্লাহৱ এবং আনুগত্য কৱ এই রসূলৱেৰ এবং তাদেৱ যারা তোমাদেৱ মধ্যে আদেশ দেয়াৰ অধিকাৰী।” (৪ : ৬০) এই ‘উলীল আমৱ’ হকুম দেওয়াৰ অধিকাৰী ব্যক্তি বলতে সাধাৱণতাৰে জাগতিক দিক দিয়ে বাদশাহ বা রাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতাৰ অধিকাৰী ব্যক্তিকে, এবং বিশেষ কৱে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যুগ—ইমামকে বোৰায়।

(এই রচনাতে আয়াতেৱ সংখ্যা গণনায় ১ কৱে বেশী হবে। ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ সহ আয়াতেৱ সংখ্যা গণনা কৱা বাঞ্ছনীয়। কাৰণ ‘বিসমিল্লাহ’ সহই সুৰাগুলিনাথিল হয়েছে।)

‘আল্লাহর এতায়াত কর, রসূলের এতায়াত কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে হকুম দেওয়ার অধিকারীর এতায়াত কর।’ আল্লাহতায়ালার এই নির্দেশের অংশ তিনটি : (১) আল্লাহর আনুগত্য কর, (২) রসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য কর, (৩) তোমাদের মধ্য থেকে (মেনকুম) উলীল আমরের আনুগত্য কর। যাঁরা আল্লাহ মানেন, রসূল মানেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক উলীল আমর মানছেন না,—তাঁরা কি এই তিনি নব্বর শর্তের স্থানে অঙ্ককারে থেকে যাচ্ছেন না? আর যাঁরা এমনও মনে করেন যে, এইরূপ ‘উলীল আমর’ মানবার দরকার নেই, না মানলেও চলবে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই অঙ্ককার কি আরও গভীর নয়? এবং এইরূপ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে যিনি মারা যান (খোদা না করুন) তিনি তো অঙ্ককারের মধ্যেই মারা যান। এ কারণেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে অর্থাৎ সমকালীন প্রত্যাদিষ্ট উলীল আমরকে না চিনে, না মেনে, মারা যাবে সে অঙ্ককার বা জাহেলিয়াতের মধ্যে মারা যাবে।

তাছাড়া, খোদাতায়ালা তাঁর মনোনীত ইমামতের ধারায় এই উচ্চতে পুনরায় প্রকাশ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠারও অঙ্ককার করেছেন কোরআন মজীদে, বলেছেনঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَعَيْنُوا الصِّرَاطَ لِسَخْنِ فَتَّاهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَغْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

‘তোমাদের মধ্য হতে যারা দৈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেতাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন—।’
(২৪ : ৪৫)

সবাই জানেন যে, খেলাফতে রাশেদার পর বাদাশাহাত কায়েম হয়। অতঃপর খেলাফতের আসল বা আধ্যাত্মিক ধারা প্রাবহিত হয়ে আসে যুগ-ইমামতের ধারাক্রমে। তবু খেলাফতের বাহ্যিক বা ঐতিহ্যগত যে ধারাটি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে জড়িত হয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছিল,

তাও তুরঙ্গ সুলতানাতের পতনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। সুলতান আব্দুল হামিদের সিংহাসনচূড়ির সঙ্গে, প্রকৃত প্রস্তাবে নাম মাত্র খেলাফত যা ছিল, তাও শেষ হয়ে যায় ১৯০৮/৯ খৃষ্টাব্দে। যদিও কামাল পাশা তার চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘোষণা করেন ১৯২৪ সালে। এই বিপর্যয়ের দরজন মুসলিম জাহানে খেলাফত আন্দোলন হয়। কিন্তু সেই খেলাফত আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তাহলে কোরআন করীমের উপরোক্ত আয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার আল্লাহতা'লা দিয়েছেন, তা কি ব্যর্থ হয়ে গেছে? এমন তো হতে পারে না যে, খোদাতায়ালা প্রতিশ্রূতি দিয়ে ভুলে গেছেন! এমনও তো হতে পারে না যে, খোদাতায়ালা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। তাছাড়া এও তো সম্ভব নয় যে, উশ্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে 'সৎকর্মশীল মুমিনদের' কোন এমন জামাত নেই যার মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাহলে তো স্বীকার করতে হবে যে, কোরআনের শিক্ষা, আহ্যরত (সাঃ)-এর আদর্শ ও ইসলামের শরীয়ত এখন সৎকর্মশীল মুমিনের জামাত গঠনে আর সক্ষম নয়। অথচ আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের প্রত্যাশা কি আমাদের সবাইকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে না যে, আল্লাহর ওয়াদা যেহেতু ব্যর্থ কিংবা রাহিত হতে পারে না; রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু অপূর্ণ থাকতে পারে না, সেহেতু মুসলিম উস্মাহর মধ্যে চিরাচরিত নিয়মে সেই মুজান্দিদ, সেই প্রতিশ্রূত খলিফা বা সেই যুগ-ইমামের আবির্ভাব নিচয়ই ঘটে গেছে; কেবল আমরাই তাঁর অব্যেষণ করিনি, তাঁকে সনাক্ত করতে পারিনি, তাঁকে চিনতে ও মানতে চেষ্টা করিনি, যার দরজন ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জীবনে আজ মুসলিম উস্মাহর এই দুঃখবহু পরিণতি?

হ্যরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর যে মহান ভবিষ্যদ্বাণী হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পূর্ণ হয়ে এসেছে তা চতুর্দশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে সহসাই কি থেমে গেছে? এই প্রশ্নেরই সমাধান দিতে চেষ্টা করবো আমরা ইন্শাআল্লাহ।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের যামানা

আজ শুক্রবার ৭ই রবিউল আউয়াল, ১৪১১ ইঞ্জরী সন। অর্থাৎ ইঞ্জরী চতুর্দশ শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে, পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হয়ে গেছে। এবং এই শতকের একাদশ বর্ষ চলছে। অথচ আমাদের আজও প্রায় সবাই জানি না যে, ইঞ্জরী চৌদ্দ শতাব্দীর প্রত্যাদিষ্ট মুজাদিদ বা যুগ-ইমাম কে?

আমরা ছেলেবেলায় বাপ-মার কাছে বয়স্ক মুরাবীদের কাছে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কথা শুনতাম। আলেম ফাজেলরাও ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বৰ্দ্ধে ওয়াজ করতেন। কিন্তু হাল যামানার মৌলবী-মওলানারা ইমাম মাহদী সম্বৰ্দ্ধে ওয়াজ করা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন? এতদিন ধরে কেন ইমাম মাহদীর প্রতীক্ষায় মুসলিম জনসাধারণকে উন্মুখ করে তোলা হয়েছিল? এখন তাঁর কথা, তাঁর আবির্ভাবের কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হচ্ছে কেন? এখন কেন ইমাম মাহদী সংক্রান্ত ওয়াজের জলসা আর হয় না?

বলা বাহ্য, ইঞ্জরী চৌদ্দ শতকের প্রথমাংশের উপরেই অতীতের বুজগানে দীন এবং ওলী-এ-কামেলগণের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। তাঁরা জানতেন যে, সময় ওটাই যা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময়। তাঁদের এই জানার ভিত্তি ছিল যেমন তাঁদের নিজেদের ঝঁইয়া, কাশক ও ওহী-ইলহাম, তেমনি তাঁদের সামনে ছিল কোরআন করীম ও হাদীসের বাণী। আল্লাহতায়ালা কোরআন করীমে বলেছেন :

يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْجُزُ النَّيْرُ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ

فِيمَا تَعْدُونَ

তিনি আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে হকুম প্রবর্তন করেন; অতঃপর ইহা তাঁর দিকে উঠে যাবে এক দিনে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর। - (৩২ : ৬)

এই আয়াতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পর তা উঠে যাওয়ার মেয়াদ বা পিরিয়ড বলা হয়েছে এক হাজার বছর; কিন্তু শরীয়তের প্রবর্তন, প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের পিরিয়ডের কথা বলা হয়নি। তবে এই মেয়াদকালেরও একটা সূপ্ত ধারণা দেওয়া আছে হাদীসে। হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

خَيْرُ الْفَرْوَنِ قَرِئَ تَقْوَى الَّذِينَ يَلْوَهُمْ تَقْوَةً يَظْهَرُ الْكَذَبُ
(آخرجه النساء أ أيضًا باب مناقب صحابة)

অর্থাৎ 'আমার শতাদীর বৎসরগুলি সর্বোৎকৃষ্ট অতঃপর তার পরবর্তী শতাদীর বৎসরগুলি, অতঃপর তার পরবর্তী শতাদীর বৎসরগুলি। এবং তারপর মিথ্যার প্রকাশ ঘটবে।'

এই হাদীসের হিসাব মতে শরীয়তের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কাল তিন শতাদী। অতঃপর কোরআনের উক্ত হিসাবে শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাল দশ শতাদী। মোট এই তের শ' বছর পরে অপধর্ম এবং ধর্মহীনতা যখন প্রকট হবে ও প্রাধান্য লাভ করবে তখনই সেই বহু প্রতীক্ষিত মহাসংক্ষারকের আবির্ভাব ঘটবে। সাধারণে যিনি ইমাম মাহদী (আঃ) নামে খ্যাত। তাঁর শুভাগমনের পূর্বের শতাদীতে এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত হতে থাকবে তাঁর আবির্ভাবের লক্ষণসমূহ। যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيَّاتُ بَعْدَ الْمَاءَتَيْنِ
(الشكوة-كتاب الفتن ص ٣٤)

"আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, (ইমাম মাহদী সংক্রান্ত) লক্ষণসমূহ সেই দুই শত বৎসর পরে প্রকাশিত হতে থাকবে যা হাজার বছর পরে আসবে।" - (মেশকাত ও অন্যান্য)।

এই লক্ষণসমূহের বর্ণনা দেওয়া আছে হাদীস শরীফে। বলা আছেঃ

"ইল্ম বা সত্যিকারের জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াত বা আধ্যাত্মিক মূর্খতা প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। ব্যতিচার প্রকাশ্যে হবে,

পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্যকাজ হ্রাস পাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝাগড়া-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি কাটাকাটি বেশী হবে; ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইমানদারী থাকবে না, ভূমিকম্প ঘন ঘন হবে, ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে; বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে মানুষ গর্ববোধ করবে; মিথ্যা সাক্ষ্য দান করার রেওয়াজ প্রচলন হবে; দল বা গোত্রের নেতা ফাসেক বা দুর্নীতিপরায়ণ হবে; জাতির নীচ ব্যক্তি নেতা হবে; বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাথান্য হবে; উটনী বেকার হবে তার পিঠে চড়ে মানুষ আর দূরদেশে যাতায়াত করবে না।” (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)। সার্বিকভাবে যামানার অবস্থার এই বিবরণ যেমন দিয়েছেন রসূলে পাক (সা:) তেমনি সীয় উম্মতের অবস্থারও এক কর্মণ চিত্র তুলে ধরেছেন, তিনি বলেছেনঃ

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ لَا يَنْهَاكُنَّ مِنَ الدِّينِ وَلَا يَنْهَاكُنَّ مِنَ
الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسْلِحَةٌ هُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ حَرَابٌ وَمِنَ الْهُدَىٰ عِلْمًا ذُهْبٌ
شَرٌّ مَّنْ نَحْتَ أَوْ بِيَوْلَسْمَاءِ مِنْ هَذِهِ هُنَّ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ
تَعْوِدُ - (بِيَهْقِي - مشكوت - مشكوت - جلد ৩ - ص ۲۸)

“মানুষের উপরে এমন এক যামানা আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া কিছু বাকী থাকবে না, কোরআনের হরফ ছাড়া কিছু বাকী থাকবে না। তাদের মসজিদগুলি হবে বড় বড় অট্টালিকা ও আড়তুরপূর্ণ, কিন্তু সেগুলি হেদায়াত-শূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টি জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে; তাদের মধ্য থেকে ফেন্দা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে।” (বাইহাকী, মিশকাত)।

আজ আপনি, আমি ,সে— আমরা সবাই কি সাক্ষী নই যে, হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ঐ ঘটনাবলী বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে? এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের ঘটনাগুলি আজ এত বেশী প্রকট যে, মনে হয় যেন

ରସୁଲେ ପାକ (ସାଃ) ଘଟନାଶ୍ଳୋ ଦେଖେ ଦେଖେ ବର୍ଣନ କରେଛେ; ଯେନ ଏହିସବ ଅବକ୍ଷୟେର ଇତିହାସ ଚୌଦ୍ଦ ଶ' ବଜର ପୂର୍ବେଇ ଲିଖିତ ହେଲିଛି। ଆଶ୍ରୟ ମହିମାବିତ ଦେଇ ନବୀ (ସାଃ) ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଧାଗୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ ଏମନ ସୁମ୍ପଟରପେ!

ଆଜକେର ଉଷ୍ମତେର ଅଥଃପତିତ ଅବଶ୍ଵାର ବିବରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଧୂତ ଏ ଏକଟି ହାଦୀସଇ ଆମାଦେର ଚକ୍ର ଖୁଲେ ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ହାଦୀସେର ବୟାନେ ତୋ ଆମି ମନେ କରି, ଆହ୍ସରତ (ସାଃ)- ଏଇ ତୀର ଅସତ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଯେଛେ। କେନନା, ଏହି ଯାମାନାତେ ନିର୍ମିତ ବିଶାଳାୟତନ ମସଜିଦଶ୍ଳୋକେ ଏବଂ ଏଇ ଯାମାନାର ଆଲେମଦେରକେ ତିନି ନିଜେର ବଲେ ସ୍ଥିରତି ଦିଲେ ଚାନନି,—ବଲେଛେନ, 'ତାଦେର ମସଜିଦଶ୍ଳୋ', 'ତାଦେର ଆଲେମଗଣ'—। ଏହି ହାଦୀସେର ବାକ୍ୟେ ବ୍ୟବହତ 'ହମ' ବା 'ତାଦେର' ସର୍ବନାମଟି ଯେକୁଣ୍ଠ ତୀର୍ତ୍ତଭାବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରା ହେଯେଛେ ଏଇ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଲେଇ ବୁଝାତେ ପାରବେନ ସେ, କଥା ଠିକ । ଆର ଠିକ ଯେ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ବର୍ଣନ କରେଛେ ଆଜ୍ଞାମା ଇକବାଲ ତାଁର କବିତାର ଦୃଢ଼ ମାତ୍ର ଚରଣେ । କବି ଲିଖେଛେ:—

'ଓସାଜା ମେ ତୁମ ହୋ ନାସାରା, ତମଦୂନ ମେ ହନୁଦ;

'ଇସେ ମୁସଲମାଁ ହ୍ୟାୟ ଜିନହେ ଦେଖକେ ଶରମାୟେ ଇୟାହଦ ।'

'ପୋଷାକେ ପରିଛଦେ ତୋମରା ଖୃଷ୍ଟାନ ତୋମରା କୃଷ୍ଟ କାଳଚାରେ ହିନ୍ଦୁ ।

ଏହି ତୋ ହଲୋ ମୁସଲମାନ ଯାଦେରକେ ଦେଖେ ଇହନୀଓ ଲଙ୍ଘା ପାଯା ।'

କବି ଆରା କଠୋରଭାବେ ବଲେଛେ :—

'କଲବ ମେ ହିସ୍ ନେହି, କରୁ ମେ ଇହୁସାସ ନେହି,

'କୁଛ ତି ପରିଗାମେ ମୁହାମ୍ମଦ କା ତୁମହେ ପାଛ ନେହି ।'

'ହନ୍ଦୟେ ଅନୁଭୂତି ନେଇ, ଆଜ୍ଞାଯ ଉପଲକ୍ଷ ନେଇ,

ମୁହାମ୍ମଦେର ପରିଗାମେର କୋନ କିଛୁଇ ତୋମାର କାହେ ନେଇ ।'

ସର୍ବୋପରି—

କୋରାନ କରୀମେ ଏହି ଯାମାନାର ବିଶେଷ କତକଶ୍ଳୋ ଅବଶ୍ଵାରା ଉତ୍ତ୍ରେ ଆଛେ। ସୁରା 'ଆଲ ତକ୍ବିରେ ବଲା ଆଛେ':

(୧) ଏବଂ ସଥନ ପରିତସମ୍ମହକେ ଚାଲିତ କରା ହବେ,

(୨) ଏବଂ ସଥନ ଦଶ ମାସେର ଗର୍ଭବତୀ ଉଚନୀଶ୍ଳୋ ବେକାର ପରିଭ୍ୟାକ୍ତ ହବେ,

(୩) ଏବଂ ସଥନ ବନ୍ଦଜ୍ମୁଗୁଲି ସମବେତ କରା ହବେ,

- (৪) এবং যখন নদীসমূহ শুকিয়ে দেয়া হবে,
 (৫) এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হবে,
 (৬) এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সংস্কেতে জিজ্ঞাসা করা হবে— কি
 অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?
 (৭) এবং যখন পৃষ্ঠক—পৃষ্ঠিকা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হবে,
 (৮) এবং যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে,—ইত্যাদি (৮১:৪-১২)
 সব ঘটনা এই যামানাতেই ঘটেছে এবং ঘটেছে। এই বর্ণনা এত স্পষ্ট যে,
 এর ব্যাখ্যা নিষ্পত্তিযোজন। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া থেকে শুরু
 করে মানুষের মহাশূন্যে পাড়ি জমানোর ঘটনাগুলি এখন আমাদের চোখের
 সামনেই ঘটেছে। সুরা আর রহমানে আছেঃ
- “তিনি দুই সম্মুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে, (এক সময়ে) উভয়ে
 মিলিত হবে।” (৫৫ : ২০)

আমরা জানি, সুয়েজ খাল খননের দ্বারা মিলিত হয়েছে ভূমধ্যসাগর ও
 লোহিত সাগর (তথা ভারত মহাসাগর); এবং পানামা খালের মাধ্যমে মিলিত
 হয়েছে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর।

বস্তুত : কোরআন করীমে এবং হাদীস শরীফে এই শেষ যুগের জন্য যে
 সকল বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাবলী নির্ধারিত ছিল তা সবই পূর্ণ হয়েছে, প্রকাশিত
 হয়েছে। কিন্তু এই শেষ যুগে যে ঐশ্বী মহাপুরুষের শুভ আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী
 ছিল, তিনি কই? যে মহামানবের আগমনের পক্ষে সাক্ষ্য দান করছে সময়,
 সাক্ষ্যদান করছে যামানার অবস্থা, সাক্ষ্য দান করছে সসাগরা পৃথিবী ও
 আকাশমণ্ডলী, তিনি কই? হ্যাঁ তাঁরই পৃত জীবনের পরিচিতি অতি সংক্ষেপে
 আল্লাহ চান তো এই রচনায় তুলে ধরবার চেষ্টা করবো আমরা।

মাহদী (আঃ) সংক্রান্ত নানা কথা

আখেরী যামানায় ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত একটি
 জরুরী প্রসঙ্গের প্রতি আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জানা
 আবশ্যিক যে, মাহদী সংস্কেতে বিভিন্ন ধরনের ধারণা ও মত প্রচলিত আছে। যদিও

এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো এত বেশী পরম্পরাবিরোধী যে যাঁরা এগুলো পড়েছেন তাঁরা অবাক না হয়ে পারেন নি। এ সম্পর্কে অনৈক্য শুধু এক বিষয়ে নয়, প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই মতবিরোধ বিদ্যমান। যেমন মাহদীর বৎশ নিয়ে এত মতানৈক্য বিদ্যমান যে, এক্ষেত্রে খোদার আশ্রয় প্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্তস্তর থাকে না। একদল বর্ণনাকারী বলেন, মাহদী হবেন হ্যরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বৎশধর। এদের মধ্যে কেউ বলেন মাহদী হ্যরত হাসান (রাঃ)-এর বৎশধর হবেন। আবার কেউ বলেন তিনি মায়ের দিক থেকে হ্যরত হাসানের এবং পিতার দিক থেকে হ্যরত হোসেনের বৎশধর হবেন। কেউ আবার বলেন, তিনি পিতার দিক থেকে হ্যরত হাসানের এবং মাতার দিক থেকে হোসেনের বৎশধর হবেন। আর একদল বর্ণনাকারী আছেন যাঁরা বলেন, মাহদী হ্যরত আব্রাস (রাঃ) এর বৎশধর হবেন। তারপর কোন কোন হাদীসে আছে মাহদী কোন বিশেষ বৎশে জন্মগ্রহণ করবেন না, বরং তিনি উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার যে কোন বৎশেই জন্মগ্রহণ করতে পারেন।

মাহদী (আঃ)-এর নাম ও পিতার নাম নিয়েও মতানৈক্য আছে। কোন কোন হাদীসে তাঁর নাম বলা আছে ‘মুহাম্মদ’; কোন কোন হাদীসে ‘আহমদ’; আবার কোন কোন হাদীসে তাঁকে ‘ঈসা’ বলে আখ্যায়িত করা আছে। সুন্নাদের মতে তাঁর পিতার নাম ‘আদুল্লাহ’; পক্ষান্তরে শিয়াদের মতে তাঁর পিতার নাম ‘হাসান’।

অনুরূপভাবে মাহদীর (আঃ) আবির্ভাবের স্থান নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান। তিনি পৃথিবীতে কৃতদিন অবস্থান করবেন সে সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। মুদ্দা কথা এই যে, তিনি মতাবলম্বীদের সবাই তাদের নিজ নিজ মতের সমর্থনে হাদীস পেশ করে থাকেন। এখন বলুন এই সব তিনি মতের বয়ান সম্বলিত এই হাদীসগুলোর সহিত হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে কিনা? এইসব কারণেই ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর সহিত সংকলনে মাহদী সহজে কোন অধ্যায় সংযোজিত করেননি। এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) করেননি। কেবল তাঁদের উভয়ের কাছে এই সকল হাদীসের বয়ান একটিও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। অবশ্য, তাঁরা উভয়েই হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সংকলন করেছেন।

এইসব কারণে, বহু আলেম মাহদী সৎক্রান্ত সমন্বয় হাদীসকেই ‘যয়ীফ’ (দুর্বল) বলে রায় দিয়েছেন, এবং বঙ্গেছেন, মাহদী সৎক্রান্ত একটি হাদীসও প্রশাতীতনয়।

এখন স্বতাবতই প্রশ্ন উঠে যে, এই প্রকারের এত বেশী মতভেদের কারণ কি? কারণ হচ্ছে—যদিও আহ্যরত (সাঃ) শেষ যুগের জন্য বিশেষভাবে একজন মাহদীর সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তবু তিনি সাধারণভাবে আরও কয়েকজন মাহদীর বা মহান ব্যক্তিত্বেরও সংবাদ দিয়েছিলেন। এইদের প্রত্যেকের আবির্ভাবের কথা ছিল তিনি তিনি সময়ে তিনি তিনি থানে। এবং এজন্যই মাহদী সৎক্রান্ত বিবরণসমূহে এত পার্থক্য ও এত মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ভুল হয়েছে এই যে, মানুষ এই সমন্বয় হাদীসকে ও বর্ণনাকে একই ব্যক্তি সম্পর্কিত বলে মনে করেছে। অর্থাৎ সব বর্ণনাকেই আরোপ করা হয়েছে শেষ যামানার ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উপরে। অথচ এই বর্ণনাগুলো ছিল তিনি তিনি সময় ও স্থানের তিনি তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে।

ইমাম মাহদীকে যারা মানে না বা মানতে চাইবে না, তাদের সেই না মানার পিছনে একটি মনন্তাত্ত্বিক কারণ ক্রিয়াশীল। বিগত শত শত বছর ধরে মাহদীকে (আঃ) নিয়ে বহু কেছা—কাহিনীর সৃষ্টি করেছে মানুষ। এমনকি এই সমন্বয় গাল—গল একেবারে ঝুঁকথার পর্যায়ে পৌছে গেছে। এরই ফলপ্রতিতে প্রত্যেকেই মনে মনে তার ইমাম মাহদীকে ‘এক কর্মিত নায়ক’ বা ‘ইমাজিনারী হিরো’ হিসাবে সৃষ্টি করে নিয়েছে। সে যখন তার সেই কল্পনার জগতের বীরনায়কের সঙ্গে বাস্তবের জগতে আগমনকারী ব্যক্তির গরমিল দেখে বা দেখবে তখন সে তাঁকে মানতে চায় না বা মানবে না।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে সব ফের্কার মুসলমানদের বিশ্বাস গভীর এবং প্রশাতীত। কিভাবে সেই পুনরুজ্জীবন ঘটবে তার গতি ও প্রকৃতি কি হবে, কিভাবে তা বাস্তবায়িত হবে,—সম্পূর্ণ হবে,—ইত্যাদি বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ফলে মুসলমানরা সারা দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে, এবং মুসলমানরা অচেল ধন—সম্পদের মালিক হবে। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়বিধি আধিপত্য ও

প্রতিপন্থি তারা অর্জন করবে যে উপায়ে তা হচ্ছে— তাদের প্রচলিত বিশ্বাস
মতেঃ

(১) বনী ইসরাইলী নবী ইসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আসমানে জিন্দা আছেন।
তিনি শেষ যুগে পৃথিবীতে নাখিল হবেন। তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষমতাধর কানা
দাঙ্গালের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে তিনি দাঙ্গালকে পরান্ত ও নিহত করবেন। অতঃপর
যুদ্ধ থেমে গেলে তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা
তুলে দিবেন। তখন মুসলমানরা নির্বিবাদে মহাপ্রতাপের সঙ্গে বিশ্বময় তাদের
শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। এবং এভাবেই ইসলামের বিজয় তথা সামগ্রিক
বিজয় সম্পন্ন হবে।

(২) হ্যরত ইসার (আঃ) হাতে কানা দাঙ্গাল নিহত হওয়ার এই
সময়কালটা হবে ইয়াম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের যামানা অর্থাৎ তখন
ইয়াম মাহদীও জাহির হবেন। এবং তিনি জাহির হয়ে পৰিব্রত কাবাঘরের নীচ
থেকে অফুরন্ত মনি মানিক্য সোনাদানা আহরণ করবেন এবং তা মুসলমানদের
মধ্যে বিতরণ করতে থাকবেন। তিনি এইসব অমূল্য সম্পদ এত বেশী বেশী
বিতরণ করতে থাকবেন যে, তা প্রহরণ করার মতো লোকই পাওয়া যাবে না।
এরই ফলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াই মুসলমানরা অনায়ারস অফুরন্ত
সম্পদের অধিকারী হবে। অতএব, পৃথিবীতে তাদের অর্থনৈতিক বিজয়
সুসম্পন্ন হবে। অতঃপর মুসলমানদের এই রাজনৈতিক এবং এই অর্থনৈতিক
বিজয় এবং তাদের প্রভৃতি, প্রতাপ ও বৈত্তব ক্ষেত্রে তক অক্ষুণ্ণ ও অব্যহত
থাকবে।

আমরা মনে করি, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা নিতান্তই হাস্যকর। এগুলি
অলস মন্তিকের কল্পনা, কিংবা ছেলেমানুষী জননা। যে কোন সুধী
চিন্তাশীল ব্যক্তি বলবেন যে, এই জাতীয় চিন্তা ভাবনার পিছনে ক্ষমতার লিঙ্গ
এবং সম্পদের লালসাই ক্রিয়াশীল। এর পিছনে মানবমনের সেই শুভ চেতনা
ও পৰিব্রত প্রেমানুভূতি ক্রিয়াশীল নেই যা মানুষকে অবিচল পরিচালিত রাখে

জীবনের চরম উদ্দেশ্য ‘খোদা মিলনের’ পথে। সারা জগতকে ইসলামের ‘সরল- সুদৃঢ় পথে’ ধাবিত করে দেওয়ার নামই তো ইসলামের বিশ্ব-বিজয়।

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে--

যে ইমাম মাহদীকে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো একজন সম্পদ বিতরণকারী নেতা হিসাবে তাঁকে আবার পরবর্তীকালে যুদ্ধ বিগ্রহকারী ইমাম বা যুদ্ধ জয়ী সেনাপতি হিসেবে মনে করা হলো কেন?

এই প্রশ্নটার জবাবের জন্য আমাদেরকে ভারতের ইতিহাসের দিকে এক নয়র তাকাতে হবে। ভারতে ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল তার প্রায় সবটাই ছিল মুসলমানদের পক্ষ থেকে পরিচালিত। মুসলমানরা তাদের হতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যই ব্যাপৃত ছিল এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহে। এই সময়টাতে এবং এর কিছু পূর্ব থেকেই উত্তর পশ্চিম ভারতে মুসলমান ও ইসলাম বিরোধী হিন্দু শিখ শাসনের বিরুদ্ধেও মুসলমানরা জেহাদ করে চলেছিল। জেহাদ করে চলেছিল, কারণ শিখ শাসনের অধীনে তখন মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপর হয়েছিল। নামাজ পড়তে বারণ করা হয়েছিল। আজান দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। মসজিদগুলোকে দখল করে পশুর খোয়াড়ে ঝুপান্তরিত করা হয়েছিল। মুসলিম নারীদের উপরে পাশবিক নির্বাতন চালানো হতো, তাদেরকে বন্দীনি করে রাখা হতো। এইরূপ বর্বর শিখশাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানরা লড়াই করে চলছিল পাঞ্জাবে, পেশওয়ারে, সীমান্ত প্রদেশে। এইসব লড়াইয়ের নেতৃত্বে ছিলেন হ্যরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ)। তিনি এক পর্যায়ে শিখদের এক কাপুরোফিত অতর্কিত গেরিলা হামলায় শাহাদৎ বরণ করেন ১৮৩১ সালে বালাকোটে। হ্যরত বেরেলভী (রহঃ) ছিলেন হিজরী তের শতাব্দীর মুজাহিদ। তিনি তাঁর মাযুরিয়াতের- প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী ঘোষণা করেন পেশওয়ারে।

যা হোক ভারতীয় মুসলমানরা খৃষ্টানদের শাসন মেনে নিতে পারছিল না প্রধানতঃ যেসব কারণে তা হচ্ছেঃ

(১) ভারতে রাজত্ব হারিয়েছিল মুসলমানরা, অন্য কোনো জাতি নয়;

- (২) নাসারা শাসনকে তারা মনে করতো দাঙ্জলিয়াতের শাসন;
- (৩) তারা মনে করতো, অটুরেই প্রতিশ্রূত ইমাম মাহদী এবং ঈসা নবী উল্লাহ আবির্ভূত হবেন;
- (৪) বিরাজমান পরিষ্ঠিতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা মনে করে নিয়েছিল যে, ইমাম মাহদী যুদ্ধ করেই নাসারাদেরকে পরাজিত করবেন এবং ভারতীয় মুসলমানদেরকে বিধর্মী শাসন থেকে মুক্ত করবেন।

ভারতীয় মুসলমানদের এই শেষোক্ত ধারাগাটি ধীরে বদ্ধমূল হয় এবং বিশ্বাসে পরিগত হয়। একারণেই, তারা হিন্দুদের ন্যায় ইংরেজ শাসনকে মানতে প্রস্তুত ছিল না; এবং তারা যুদ্ধ করেই ইংরেজদেরকে পরাজিত করার জন্য সারা ব্রিটিশ ভারতে আন্দোলন করে যাচ্ছিল। এইসব আন্দোলনের এক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল ওয়াহাবীরা।

এ সময়ে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব নিয়ে নানা কথা নানাভাবে প্রচারিত হচ্ছিল। উইলিয়াম হান্টার তার ‘দি ইডিয়ান মুসলমানস’ পুস্তকে লিখেছেন, বহু উলেমা এবং পীর মাশায়েখরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই ইমাম মাহদী জাহির হবার কথা। এ বিষয়ে, হান্টার লিখেছেন, সুরীদের তুলনায় শিয়াদের হিসাব ছিল অধিকতর নির্ভুল। শিয়াদের হিসাব অনুসারে হিজরী ১২৬০ সাল (১৮৪৪ খৃঃ) ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের কথা। ভারতীয় ওয়াহাবীরা হয়রত বেরেলভী (রহঃ) কেই ইমাম মাহদী মনে করতো। হান্টার তার পুস্তকে ঐ সময়ে ব্যাপক প্রচারিত এবং সে কারণে বহুল প্রক্ষেপিত, হয়রত শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওলী (রহঃ) এর নানা ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত কবিতারও কিছু অনুবাদ দিয়েছেন। তাতেও হয়রত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তাতে এও আছে যে, মাহদীর নাম হবে ‘আহমদ’। যদিও হান্টার লিখেছেন, শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওলীর মূল আরবী কসিদায় আছে মাহদীর নাম ‘মুহাম্মদ’ হবে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াহাবীরা পবিত্র মক্কা নগরী দখল করে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে। এবং পরের বছর তারা দখল করে মদীনা শরীফ। তারা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধর্মসলীলা সাধন করে। তখন সারা মুসলিম জাহানে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি

হয়েছিল। হান্টার এই নৃশংস ঘটনাকে তুলনা করেছেন দস্যু বুর্বনের ধারা ভ্যাটিকান সিটি খৎস হওয়ার সঙ্গে। অবস্থা এরূপ আকার ধারণ করেছিল যে, পবিত্র হজ্জ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা চলেছিল ১৮০৩ থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত।

ভারতের ওয়াহাবী-বিরোধীরা ওয়াহাবী নেতা মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবকে মনে করতো একজন জাল ইমাম। তারা বিশ্বাস করতো ‘ঠি জাল ইমামের সাগরেদ অন্তর্বলে পবিত্র নগরী দখল করেছিল, হজ্জের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং পবিত্র কাবাগুহের দরজার উপরে লিখেছিল—লা ইলাহা ইল্লাহু অস্ত্বো রসূলুল্লাহ’। (হান্টার)।

ইত্যাকার অবস্থায় এই বিশ্বাসটা এবং তার প্রচারণা খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল যে অচিরেই, এখনই, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। এবং তিনি যুদ্ধ করে কাবা শরীফ পুনরুদ্ধার করবেন, এবং নাসারাদেরকেও যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতে পুনরায় মুসলিম শাসন কার্যম করবেন। অতএব, এই বিশ্বাসটা সাধারণে ছড়িয়ে যায় যে, ইমাম মাহদী হবেন যুদ্ধ বিশ্বারদ অর্থাৎ একজন রক্তপাতকারীসেনানায়ক।

ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ)

আরও একটি ধারণা আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, আধ্যৈরী যামানায় দুইজন মহামানবের আগমন হবে একই সঙ্গে: একজন মাহদী (আঃ) অপরজন—ঈসা (আঃ)। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এই বিশ্বাসও পোষণ করা হয় যে, এই দুই মহামানবের মধ্যে নেতৃত্ব বা ইমামতি করবেন মাহদী (আঃ), এবং তাঁর অনুসরণ বা একেন্দ্রী করবেন ঈসা (আঃ) অন্যান্য মানুষের মতই। কিন্তু এই জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস ভাস্ত তো বটেই বরং হাস্যকরও। কারণ জাতির আকছার বা অধিকাণ্ড মানুষ যখন গোমরাহ হয়ে যায়, শিরকী বিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়ে, জাতি যখন কল্যাণকর নেতৃত্বের শক্তি হারিয়ে ফেলে তখনই খোদার নবীর আবির্ভাব

ঘটে। তিনি অবতীর্ণ হয়ে নেতৃত্ব দান করেন, জাতিকে উদ্ধার করেন এবং হেদোয়েতের পথে পরিচালিত করেন। সুতরাং কোন নবী কখনও, নবী নল এমন ব্যক্তির নেতৃত্ব বা ইমামতির অধীনে জাতির সংস্কার সাধন ও উন্নতি দানের কাজ করেন না। এটা তাঁর ঐশ্বী মর্যাদার খেলাফ। আল্লাহু যাঁকে আপন বিশেষ ফজলে ও রহমে নবুওতের অন্য নেয়ামতে ভূষিত করেন তিনিই তাঁর যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। অন্য কারো নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে ধর্মের কাজ করার এখতিয়ার তাঁর থাকে না, তিনি তা করেনও না। সুতরাং ইসা (আঃ) আবির্ভূত হলে নেতৃত্বদানের শুরুদায়িত্ব তাঁর ক্ষেত্রেই ন্যস্ত থাকবে। এই তত্ত্বটা উপলক্ষ করে কোন কোন বৃক্ষিমান প্রচলিত ধারণাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বলেন যে, ইসা (আঃ) যখন এই দুনিয়াতে পুনরায় নাযিল হবেন তখন তিনি আর ‘নবী’ থাকবেন না। এই ধারণাটা আরও বেশী ভাস্ত এবং নবুওতের পবিত্র মোকাম ও মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা যোদা যাঁকে নবুওতের বিরল কল্পাণে বিভূষিত করেছেন তাঁকে ‘নবী’ না বলার স্পর্ধা কারো থাকা উচিত নয়। হ্যরত রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর স্বীয় পবিত্র বাণীতেও আগমনকারী ইসা (আঃ)-কে বার বার ‘নবীউল্লাহ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন— (দ্রঃ—মুসলিম)। সুতরাং তাঁকে ‘নবী’ না বলার অধিকার অন্য কারও নেই। আর, যামানার যিনি নবী তিনিই যামানার ইমাম। নবীর বর্তমানে নবীই ইমাম, অন্য কেউ নয়, অতএব ইসা (আঃ) আবির্ভূত হলে তিনিই হবেন ‘ইমাম’। যিনি নবী তিনিই ইমাম। এটাই অবিসংবাদিত।

এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, তাহলে কি ইসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এবং ইমাম মাহদী (আঃ) একই ব্যক্তি? তাহলে কি এই উশ্মতে জন্মগ্রহণকারী ইমাম মাহদীকেই ইসা ইবনে মরিয়ম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে? তাহলে কি ইসা (আঃ) যিনি বনী ইসরাইলীদের জন্য নবী ছিলেন তিনি নেই? মারা গেছেন?— ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোরও জবাব আমাদের পেতে হবে।

এই প্রসঙ্গে, আরও একটি প্রশিদ্ধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ যুগে বা ঘোর কলিকালে পৌড়িত ও পতিত মানবতার পরিত্রাগের জন্য এক মহামানবের আবির্ভাবের বিশ্বাস প্রচলিত প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই রয়েছে। এই বিশ্বাসটা শুভ এবং সার্বজনীন। প্রত্যেক ধর্মের গ্রন্থসমূহে এ

বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, আছে নানাবিধ সক্ষণের বিবরণ। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, ঘোর কলিতে ‘নিষ্কলঙ্ক কঠি’ অবতারের বা শীকৃষ্ণের পুনরায় আবির্ভাব ঘটবে। জরথুষ্টের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, শেষ যুগে ‘মসীও দারবাহূমী’ আগমন করবেন। ইহুদীরা জেরুজালেমের ‘ক্রন্দন দেওয়ালের’ পাশে বসে ‘মসীহ’ এর আগমন প্রার্থনা করে ক্রন্দন করেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস ‘মৈত্রেয়’ এর আগমন হবে। খৃষ্টানরা বিশ্বাস রাখেন যে, ‘ঈশ্বর পুত্র’ যীশুর পুনরাগমন আসন্নপ্রায়। আর মুসলমানদের আকিদা হচ্ছে, আখেরী যামানায় ইমাম মাহদী (আঃ)–এর আবির্ভাব ঘটবে। মোট কথা, সকল ধর্মেই এই সর্বজনবাদী সুসংবাদটি পূর্ব পরিবেশিত যে, শেষ যামানায় একজন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের আগমন হবে। আশাভরা এই বিশ্বাসও সার্বজনীন যে, সেই প্রতিশ্রূত মহামানব আবির্ভূত হয়ে তাঁর ঐশ্বী নেতৃত্বের কল্যাণে সারা বিশ্বের সকল মানুষকে একত্রে মিলিত করবেন একমাত্র সত্য ধর্মের পতাকাতলে। তখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের চিরকাউক্ষিত সুখ ও শান্তি। প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থগুলিতে সেই মহা মানবের আগমনের সময়ের ও অবস্থার যে সকল বর্ণনা দেওয়া আছে, সেগুলোর পরম্পরার মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বর্ণনার এই সামঞ্জস্য এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পেশ করে যে, প্রতিশ্রূত সেই মহামানব একই ব্যক্তি,—একাধিক নন। তফাহ যা, তা শুধু নামে বা উপাধিতে। অন্যথায় শেষ যামানায়, যদি প্রচলিত প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যে এক একজন করে মহামানবের আগমন ঘটে এবং এই মহামানবগণের প্রত্যেকেই যদি পৃথক পৃথকভাবে তাদের স্ব স্ব সত্য ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন পতাকাতলে সকল বিশ্বাসীকে একত্রে মিলিত করার চেষ্টা চালান, তাহলে এই ভিন্ন ভিন্ন সত্যধর্মসমূহের (?) পরম্পরার কোনো আর কোলাহলে জগৎময় তুলকালাম কাঢ় বেঁধে যাবে; তখন আসল সত্যই মারা পড়বে; শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই প্রবল হয়ে উঠবে। কিন্তু তা কি হতে পারে? পারে না। এবং পারে না জন্যই, এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই বাতিল করা যায় না যে, সত্যধর্ম যেহেতু এক,—একাধিক নয়, সেহেতু শেষ যুগের প্রতিশ্রূত মহামানবও এক—একাধিক নন।

একটি অসামান্য নির্দশন

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে শেষ যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রূত মহামানবের আবর্তাবের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য এবং সার্বজনীন হচ্ছে—চন্দ্ৰগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নির্দশনগুলি। এই অনন্য সাধারণ ঐশী নির্দশনগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন সাইয়েদনা ও মওলানা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহোৱায়ালা আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُهْدِيَّ يَعْلَمُ مَا تَكُونُ أُمَّةُ الدُّخْلُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَنْكِسُ فَتَنَّ
الْقَمَرُ لَوْقَلْ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكِسُ الشَّمْسُ فِي الصِّفَافِ مِنْهُ -

(دارقطن)

‘আমাদের মাহুদীর সত্যতার এমন দুটি নির্দশন আছে যা আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া অদি আজ পর্যন্ত অন্য আর কারো সত্যতার নির্দশন রূপে প্রদর্শিত হয়নিঃ একই রমজান মাসে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্ৰগ্রহণ এবং মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে। (দারকুতনী)।

চন্দ্ৰগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঐ অভূতপূর্ব ঐশী নির্দশন দুটি প্রকাশিত হয়েছ ১৩১১ হিঃ মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একবার পূর্ব গোলার্ধে এবং আর একবার ১৩১২ হিঃ মোতাবেক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম গোলার্ধে। ফলে সারা দুনিয়ার মানুষের মাথার উপরে সংঘটিত হয়েছে ঐ দুটি আসমানী নির্দশন এবং জাতি ধর্ম বৰ্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য আদম সত্তানের সামনে প্রত্যক্ষে ঘোষণা কৰা হয়েছে সেই প্রতিশ্রূত এবং বহু প্রতীক্ষিত মহামানবের আগমন বার্তা। কিন্তু কে সেই ঐশী প্রতিশ্রূত মহামানব?

বলে রাখা দরকার যে, প্রাকৃতিক নিয়ম বা Natural Law অনুযায়ী চন্দ্ৰে ও সূর্যে গ্রহণ সাগার নিয়ম হচ্ছেঃ চান্দ্ৰ মাসের ১৩ই ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে অর্থাৎ পূর্ণিমার সময় এই তিনি রাত্রির যে কোন এক রাত্রিতে চন্দ্ৰগ্রহণ লাগে; এই আগুপিছু ঘটে থাকে প্রথম তারিখের চৌদের আগুপিছু উদয়ের দরমণ, যে

কারণে চান্দুমাস কখনও হয় ২৯ দিনে আর কখনো ৩০ দিনে। এই একই কারণে সূর্যগ্রহণের বেলায়ও আশুপিছু হয় এবং সূর্যে গ্রহণ লাগে অমাবস্যার সময়ে অর্থাৎ চান্দু মাসের ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখের যে কোনো এক দিবসে। যদি কেউ মনে করে যে, চাঁদের প্রথম তারিখেই চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং মধ্যম অর্থাৎ পূর্ণিমার তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে, তাহলে তা ভুল হবে। কেননা প্রথমতঃ ১ম, ২য়, ও তৃতীয় তারিখের চাঁদকে আরবীতে বলা হয় ‘হেলাল’ এবং ৪র্থ তারিখ থেকে বলা হয় ‘কমর’। এই ‘কমর’ শব্দটি ৪র্থ তারিখ থেকে পূর্ণিমা ছাড়া বাকী সব তারিখের জন্য প্রযোজ্য। পূর্ণিমাকে আরবীতে ‘বদর’ বলে। হাদীসের ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা ‘কমর’, ‘হেলাল’ নয়। তৃতীয়তঃ প্রথম তারিখের হেলাল বা নয়া চাঁদে গ্রহণ লাগলে (যদিও তা সম্ভব নয়) তা মানুষের চোখে পড়ার আগেই ডুবে যাবে, এবং একারণেই তা দুনিয়ার মানুষের জন্য আসমানী নির্দশন হতে পারবে না। তৃতীয়তঃ: মধ্যম তারিখ বলতে যদি বুঝা হয় ১৫ তারিখ, কিংবা মাস ২৯ দিনে হলে ১৪ $\frac{1}{2}$ তারিখ, তাহলেও ভুল হবে। কারণ সূর্যগ্রহণ পূর্ণিমার সময়ে হয় না, হয় অমাবস্যার সময়ে। এটাই সৌরমণ্ডলে পরিচালিত নিয়মের শূঙ্খলা। এর ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব। আল্লাহর সৃষ্টি মহাজাগতিক নিয়ম শূঙ্খলা এতই সুনিয়ন্ত্রিত যে তার আচর্য আবর্তন বিবর্তনের নিয়মানুবর্তিতা দেখলে নাস্তিকেও খোদার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। কাজেই তাতে কোন অনিয়ম নেই; অনিয়ম ঘটলে সৌরমণ্ডল ও ছায়াপথে, অন্ততঃ আমরা যার বাশিন্দা, তাতে বিশঙ্খলা দেখা দিবে, এই সৃষ্টি চূর্মার হয়ে যাবে। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ যথা নিয়মেই সংঘটিত হয়েছে। এবং তার খবর প্রকাশিত হয়েছে ঐ সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও পরে পুথি-পৃষ্ঠকে।

সময়টা ছিল হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ১৩১১ হিজরীর ১৩ই রমজান (২১-৩-১৮৯৪ইং) তারিখে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ হয়, এবং ২৮ শে রমজান (৬-৪-১৮৯৪ইং) তারিখে সকাল ৯টা থেকে ১১

টা পর্যন্ত সূর্য গ্রহণ হয়; এ গ্রহণদ্বয় ঘটে পূর্বগোলার্ধে। পর বৎসরে ১৮৯৫ সালে, হিসাব মোতাবেক ১৩১২ হিঃ সনের রমজান মাসের যথা তারিখদ্বয়ে যথা নিয়মে আবারও সংঘটিত হয় উক্ত চন্দ্ৰগ্রহণ (১১-৩-৯৫) ও সূর্যগ্রহণ (২৬-৩-৯৫) পশ্চিম গোলার্ধে। এইগুলি কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। এসবে মানুষের কোন হাত নেই। গ্রহণের এই নির্দশন প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেইভাবে যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তের শত বৎসর পরে প্রকাশিত জ্যোতিক্ষমগুলীতে সংঘটিত ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে, হ্যারত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল গ্রীষ্মে প্রেরণা লক্ষ এবং লোকাতীত। কিন্তু কই সে ইমাম মাহদী (আঃ) যাঁর সত্যতার স্বপক্ষে সংঘটিত হয়েছিল গ্রেসব অসামান্য স্বর্গীয় নির্দশন ?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি আসমানী নির্দশনের উল্লেখ করা যায়। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় আকাশে পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্র অর্থাৎ ধূমকেতু উদিত হবে। এবং সেই ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল যথাসময়ে। কিন্তু কোথায় সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ) ?

হ্যারত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে অক্ষরের হিসাবে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আল্লামা ইবনে খলদুন লিখেছেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ইবনে আরাবীর শিষ্য-সাগরেদদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জারি ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে অনেক ক্ষেত্রে পর্দা থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তা ইঙ্গিতে বা ঝুঁপকেও বর্ণনা করা হয়। ফলে তার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে মানুষের ভুল হতে পারে। ইবনে খলদুন উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেছেন ইবনে আবি ও আতিলের হাওয়ালা দিয়ে এভাবে :

ওয়া জহুরা ইয়াকুনা যিম বাদে মাজি জিম ফে খে মেনাল হিজরাতে-

অর্থাৎ প্রতীক্ষিত ইমামের আবির্ভাব ঘটবে হিজরত থেকে জিম ফে খে অতিবাহিত হলে পরে।

আবজাদের পদ্ধতি অনুযায়ী এই অক্ষর তিনটির হিসাব সংখ্যা দাঁড়ায় (জিম=৬০০+ফে=৮০+খে=০৩) ৬৮৩। এই হিসাব ধরে ধারণা করা

হয়েছিল যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের কাল হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ। কিন্তু সেই যামানা অতীত হয়ে গেছে প্রতীক্ষিত ইমামের আবির্ভাব হয়নি। এরই জের ধরে ইবনে খলদুন লিখেছেন যে, যামানা তো অতীত হয়ে যাচ্ছে অথচ কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে না - (মুকাদ্দামা)।

একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, হয়রত ইবনে আরাবীর (রহঃ) উক্ত কাশ্ফী ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃত প্রস্তাবে সঠিক ছিল। দুর্ভাগ্য যে, তাঁর শিষ্য সাগরেদরাই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে ভুল করেছিলেন, এবং সেই ভুলেরই উপর নির্ভর করে মন্তব্য করেছেন ইবনে খলদুন। আসলে ইবনে আরাবী যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, তাঁর নিজের সময়কাল থেকে নিয়ে ৬৮৩ হিঃ সনে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে। ইবনে আরাবীর জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে ৬২৮/২৯ হিঃ। এই সময়েই তিনি মক্কা শরীফে থেকে রচনা করেন তাঁর অমর গ্রন্থ ‘ফতুহাতে মক্কীয়া’। বস্তুতঃ এই সময়ের পরবর্তী ৬৮৩ হিঃ সনের সময়কাল চিহ্নিত করেছেন তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে। এখন আমরা যদি ৬২৮ এর সঙ্গে ৬৮৩ যোগ করি তাহলে পাই ১৩১১ হিঃ সন; এবং আল্লাহু পাকের লাখো কোটি শুকরিয়া যে, এই ১৩১১ হিঃ সনেই ঘটেছিল সেই একই রমজান মাসের চন্দ্র ও সূর্য়গ্রহণের অসামান্য আসমানী নির্দর্শন। এবং পরবর্তী রমজানে আবারও। পরিত্র হাদীসে বর্ণিত উক্ত গ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর নিঃসংশয় উল্লেখ করা হয়েছে সে সমস্ত কিতাব পুস্তকে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে :

(১) ‘ফাতাওয়া হাদিসিয়া হাফেজ ইবনে হজর মক্কী’ গ্রন্থকার : আল্লামা শেখ আহমদ শাহাবুদ্দীন ইবনে হাজর আল হাশেমী, মিসরে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৩১;

(২) ‘আহওয়ালুল আখেরাত’-মৌঃ মুহাম্মদ রমজান হানাফী মুজতাবায়ী;

(৩) ‘হজাজুল কেরামা’- নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব, পৃঃ ৩৪৪;

(৪) 'আকায়েদুল ইসলাম' - মৌঃ আব্দুল হক সাহেব মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ); পৃঃ ১৮৬, মৃঃ ১২৯২ হিঃ;

(৫) 'কিয়ামত নামা' - ফার্সী ও 'আলামতে কেয়ামত' - (উর্দু) - হযরত শাহ রফী উদ্দীন সাহেব মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ);

(৬) 'মকতুবাত' - হযরত ইমাম রক্বানী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২;

(৭) শিয়াদের কিতাব-'বাহারুল আনওয়ার' ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৮৫; 'আকমালুদ্দীন' - পৃঃ ৩৬৮;

এছাড়া, হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওলী (রহঃ) এর 'দীওয়ান' এর (রচনাকাল ৫৬০ হিঃ) ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এক ফার্সী কবিতায় আছে :

মাহদী ওয়াক্ত ও ঈসা দাওরান

হর দণ্ডে শাহ সওয়ার মে বীনম

মাহরারু ছীয়াহ মে নিগরম

মাহর রা দিল ফুগার মে বীনম;

অর্থাৎ --

তিনি যামানার মাহদীও হবেন ঈসাও হবেন, তিনি উভয় গুণের অধিকারী। আমি চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ লাগা দেখতে পাচ্ছি।

এইচ. এ. ওয়ান্টারও লিখেছেন :

'A further sign of the last days, which were frequently told is referred to the Quran and given in detail in a tradition is that, an eclipse of the Moon and the Sun will then occur, respectively on the 13th and 28th of the month of Ramadan. This occurred in 1894.' (H. A. Walter : The Ahmadiya Movement, P. 30)

হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু

শেষ যুগের জন্য প্রতিশ্রূত মহামানব যে একজন, একাধিক নন, এই যথার্থ বিশ্বাসটার পথে কোন অস্তরায় অন্যসব ধর্মাবলম্বীদের জন্য না থাকলেও মুসলিমানদের জন্য আছে। এই অস্তরায় হচ্ছে – মুসলিমানদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বনী ইসরাইলী নবী ঈসা (আঃ) অদ্যাবধি জীবিত আছেন, তবে পৃথিবীর বুকে নয় আকাশে কোথাও। তিনি আখেরী যামানায় আকাশ থেকে নাযিল হবেন এবং ইসলামের খেদমতে আত্মনিরোগ করবেন ইমাম মাহ্মুদ (আঃ)-এর নেতৃত্বের অধীনে। প্রচলিত এই বিশ্বাসটাকে আমাদের পরখ করে দেখা উচিত পরিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে। আমরা যদি দেখতে পাই যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) সত্য সত্যই জীবিত আছেন আকাশে বিগত প্রায় দু হাজার বছর যাবৎ, তাহলে তাঁর অবতরণ করার সম্ভাবনাকে বাতিল করা যাবে না। এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এটাও মানতে হবে যে, আখেরী যামানার জন্য প্রতিশ্রূত মহামানব একজন নন, দুইজন। একজন আকাশ থেকে নেমে আসবেন, অপর জন এই পৃথিবীর বুকে জন্ম প্রাপ্ত করবেন।

প্রথমে আমরা দেখতে চাই, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকা বা মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে কোরআন করীমের রায় কি ?

আমরা জানি, হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন এন্টেকাল করেন তখন অনেক সাহাৰা, এমনকি হ্যরত ওমর (রাঃ) পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন হ্যরত আবু বকর সিন্দিক (রাঃ)। তিনি এসে সবাইকে আ হ্যরত (সাঃ)-এর মৃত্যু হয়ে যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করার জন্য কোরআনের যে আয়াত তেলাওয়াৎ করেছিলেন তা হচ্ছে :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأُنْتَ أَوْ قُتِلَ

أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

“এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়েছে। অতএব, সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তা হলে তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাত্ম পশ্চাতে) ফিরে যাবে।” (৩:১৪৫)।

এই আয়াত যখন সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পাঠ করলেন তখন সবাই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হতে পারলেন যে পূর্বেকার নবী রসূলগণ যেমন সকলেই মারা গেছেন, তেমনি রসূলে পাক (সাঃ)ও মারা গেছেন। তখন কেউই একথা বলেননি যে, পূর্ববর্তী নবী ঈসা (আঃ) বেঁচে আছেন। এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আঁ হ্যরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর সাহাবাগণের (রাঃ) প্রথম ‘এজমা’ বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাই ছিল যে, আঁ হ্যরত (সাঃ) এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীই মারা গেছেন। কোন নবীই জীবিত নেই, না আসমানে না যমীনে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কোরআন শরীফে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কোন কথা কি খাসভাবে আছে? এর উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ আছে, নিচ্যই আছে। যেমন, আল্লাহত্তাআলা বলছেন :

يُعِيسَى إِنِّي مُتَوْفِيقٌ وَرَافِعٌ كَمَا

“---- হে ঈসা! নিচ্য আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করব।” (৩:৫৬)।

সূরা মায়েদাতে আছে ঈসা (আঃ) বলেছেন :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ

“---- এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী।” (৫:১১৮)।

এই দুটি আয়াত থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) মারা গেছেন।

এই উভয় আয়াতে ব্যবহৃত ‘ওফাহ’ (মৃত্যু) শব্দটি নিয়ে বিতর্কের সূষ্ঠি করা হয়, বলা হয় – এস্তলে ‘ওফাহ’ অর্থ মৃত্যু হবে না, – হবে ‘আকাশে উঠিয়ে নেওয়া’ কিন্তু আশ্চর্য যে, ‘ওফাহ’ শব্দটির এইরূপ অর্থ করা হয় কেবল ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রেই অন্য কোথাও নয়। জানাজার নামাজের দোয়ার মধ্যেও আছে এই ‘ওফাহ’ শব্দটি এবং এই দোয়া সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন শত শত বার পাঠ করা হচ্ছে মৃত্যুক্তির লাশ সামনে রেখে এবং সর্বত্রই ‘ওফাহ’ শব্দের অর্থ করা হচ্ছে মৃত্যু। অথচ সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে শব্দটির ভিন্ন অর্থ করা হচ্ছে, এটা কি ঠিক ?

সূরা মায়েদার উল্লিখিত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতি আমরা একবার দৃষ্টি দিতে চাই। এই আয়াতে আছে আল্লাহত্তাআলা ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করবেন :

“হে ঈসা ইবনে মরিয়ম। তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে – ‘আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে এবং আমার মাকে দুই মাবুদরূপে গ্রহণ কর?’”

এই প্রশ্নের উত্তরে ঈসা (আঃ) বলবেন :

“তুমি পরম পরিব্রত, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, আমি এমন কিছু বলি যা বলবার অধিকার আমার নেই”

----- এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাদের উপরে সাক্ষী ছিলাম কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাত (মৃত্যু) দিলে তারপর তুমিই ছিলে তাদের উপরে তত্ত্বাবধায়ক --।” (৫:১১৭, ১১৮)

এই কথপোকথন হবে কেয়ামতের দিনে। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, কেয়ামতের পূর্বে যদি কখনো ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন তাহলে কি তিনি দেখতে পাবেন না যে, খৃষ্টানরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে মাবুদরূপে উপাসনা করছে ? অবশ্যই দেখতে পাবেন। তাহলে সেমতাবঙ্গায় তাঁর পক্ষে আল্লাহর কাছে একথা বলা কি সম্ভব হবে যে, তিনি খৃষ্টানদের অধঃপতনের বিষয়টা কিছুই জানেন না ? তিনি কি আল্লাহর কাছে মিথ্যে কথা বলবেন ? বলবেন না। নবী কখনই মিথ্যে বলেন না। অতএব সূরা মায়েদার এই আয়াত দুটির প্রতি নিরপেক্ষ মন নিয়ে তাকালেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন এবং

তাঁর ওফাতের পরেই খৃষ্টানদের অধঃপতন ঘটেছে। এবং তিনি আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। আর, যিনি মারা যান তাঁকে আর দ্বিতীয়বার আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠান না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

“এমন কি যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন সে বলে ‘হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও । এবং তাদের পিছনে সেইদিন পর্যন্ত এক পর্দা বিস্তীর্ণ যখন তারা পুনরুত্থিত হবে ।’”
(২৩:১০০, ১০১); (দ্রঃ ২১:৯৬) ।

এক্ষণে আমরা হ্যরত রসূলে আকরাম (সাঃ) এর পরিত্র বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। ইবনে আববাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত বোখারী শরীফের এক হাদীসে আছে : হ্যরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন আমার সাহাবাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বাম দিকে অর্থাৎ দোজখের দিকে নিয়ে যেতে দেখে আমি বলতে থাকবো “উসায়হাবী, উসায়হাবী” - ‘ওরা তো আমার সাহাবী, আমার সাহাবী’। উত্তরে আল্লাহত্তাআলা বলবেন, - ‘ওরা তোমার পরে তোমার বিরুদ্ধ পথের যাত্রী ছিল’। এই কথা শুনে আমি আল্লাহর নেক বান্দা ঈসার ন্যায় এই বলে চুপ হয়ে যাব যে,

“যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, আমি তাদের উপরে সাক্ষী ছিলাম; কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাএ দিলে, তারপর তুমিই ছিলে তাদের উপরে তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সকল বিষয়ের উপরে সাক্ষী ।”
(৫:১১৮) ।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কেয়ামতের দিনে ঈসা (আঃ) যেভাবে ‘ফালাম্বা তাওয়াফ্ফায়তানি’ - ‘যখন তুমি আমাকে ওফাএ দিলে’ - বলে আল্লাহর কাছে নিজ উশ্মতের অধঃপতনের অবস্থা না জানার কথা ব্যক্ত করবেন, ঠিক তেমনিভাবে সেই কেয়ামতের দিনে সেই একই কথা-ফালাম্বা তাওয়াফ্ফায়তানি - ‘যখন তুমি আমাকে ওফাএ দিলে’ - বলেই আঁ হ্যরত (সাঃ) ও আল্লাহর কাছে তাঁর ঐ সব সাহাবীর গোম্রাহীর অবস্থা না-জানার কথা ব্যক্ত করবেন। অতএব, এই আয়াতের ‘ওফাএ’ শব্দের অর্থ যখন স্বয়ং রসূলে পাক (সাঃ) করছেন ‘মৃত্যু’ এবং তা প্রয়োগ করছেন তিনি নিজের উপরেই, তখন ঈসা (আঃ) - এর ক্ষেত্রে এই আয়াতের এই ‘ওফাএ’ শব্দের ভিন্ন কোন অর্থ করবার অধিকার না কোন মুসলমানের আছে, না অন্য কোন মানুষের। সুতরাং প্রমাণিত সত্য এটাই

যে, হ্যারত ইসা ইরনে মরিয়ম (আঃ) স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সূরা নেসার দু'টি আয়াতের তাৎপর্য আলোচনা করা কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। কেননা, মাত্র এই দুটি আয়াতের উপরে নির্ভর করেই অনেকে বলতে চেষ্টা করেন যে, ইসা (আঃ)-কে সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠায়ে নেওয়া হয়েছে। এই আয়াত দুটি হচ্ছে :

وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِنْسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُنْ شَيْهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مَا لَهُمْ بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظُّنُونِ وَمَا قَاتَلُوهُ يَقِيْنًا ۝ بَلْ رَفْعَهُ اللَّهُ
إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

“এবং তাদের এই বক্তব্যের কারণে, আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র ইসা মসীহকে নিশ্চয় হত্যা করেছি, অথচ না তারা তাকে হত্যা করেছিল, এবং না তারা তাকে ত্রুশে বিন্দু করে হত্যা করেছিল, বরং তাদের নিকটে তাকে (ত্রুশ-বিন্দু মৃত্যে) অনুরূপ করা হয়েছিল; এবং নিশ্চয় যারা তার ব্যাপারে মতভেদ করে তারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত; তাদের এই বিষয়ে কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান নেই, কেবল অনুমানের অনুসূরণ ব্যতীত এবং নিশ্চিতরূপে তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে তার দিকে উন্নীত করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।” (৪:১৫৮-১৫৯)

প্রথম কথা হলো,— কোরআন শরীফের অন্য কোথাও যেমন নেই, তেমনি এই আয়াত দুটিতেও নেই যে, ইসা (আঃ)-কে আকাশে উন্নীত করা হয়েছে বরং এখানে আছে যে, তাঁকে আল্লাহর দিকে উন্নীত করা হয়েছে। আল্লাহর কোন দেহ নেই, তিনি আকাশে নির্দিষ্ট কোন স্থানে থাকেনও না। সুতরাং, আকাশে সশরীরে আল্লাহর কাছে উঠে যাওয়ার কথাটা অবাস্তৱ। এই বিষয়টির সঙ্গে ইহুদী বিশ্বাস জড়িত। ইহুদীদের সেই বিশ্বাসেরও আলোচনা দরকার।

ইহুদী-বিশ্বাস ও ঈসা (আঃ)-এর ওফাৎ

হয়েরত ঈসা (আঃ)-কে নিহত করা হয়েছিল কি উপায়ে, তা নিয়ে প্রাচীনকালে ইহুদীদের মধ্যে দু'প্রকারের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। একদল বিশ্বাস করে যে, প্রথমে তাঁকে হত্যা করা হয় তরবারির আঘাতে এবং পরে জনগণের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁকে ক্রুশে লটকানো হয়। অপরদলের বিশ্বাস হলো, প্রথমেই তাঁকে ক্রুশে লটকান হয় এবং ক্রুশে লটকানোর পরে তাঁকে তরবারি দিয়ে কতল করা হয়। বস্তুতঃ ইহুদীদের এই দু'প্রকারের বিশ্বাসই ভুল। প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এগুলির কোন মিল নেই। তাই, এই উভয় বিশ্বাসকেই খন্দন করেছেন আল্লাহত্তাআলা এই বলে :

‘তাকে তারা কতল করেও মারতে পারেনি, সলিবে (ক্রুশে) দিয়েও মারতে পারেনি।’ এখানে আল্লাহত্তাআলা কতল করে মারার দাবীটাকেই নাকচ করেছেন প্রথমে। কেননা, ওটাই ছিল ইহুদীদের মূল দাবী :

‘নিশ্চয় আমরা কতল করেছি আল্লাহর রসূল মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়মকে।’ কিন্তু, আল্লাহর কালামে যেহেতু কোন ফাঁক বা হেরফের থাকে না, সেহেতু ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার দাবীটাকেও নাকচ করা হয়েছে সঙ্গে, বলা হয়েছে : ‘তাকে তারা কতল করেও মারতে পারেনি, সলিবে দিয়েও মারতে পারেনি।’ ফলে, একইসঙ্গে ক্রুশ সম্পর্কিত খৃষ্টানদের বিশ্বাসটাকেও বাতিল প্রমাণিত করা হয়েছে।

তৌরাত অনুযায়ী ইহুদীদের একটা আকিদা এই যে, নবুওয়তের কোন দাবীদার যদি কতল হয়ে যায়, তাহলে সেই দাবীদার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্থ হয়, সে সত্যনবী প্রমাণিত হয় না। এটাও তাদের আকিদা যে, যাকে ক্রুশে দিয়ে মারা হয়, সে অভিশঙ্গ (লানতী) সাব্যস্ত হয়। এবং – এইরূপ মিথ্যাবাদী ও লানতী ব্যক্তির রূহ (আঘা) আল্লাহর দিকে উন্নীত হয় না বা ‘রাফা’ লাভ করে না।

ইহুদীদের বিশ্বাস, ‘ঈসা ইবনে মরিয়মের মৃত্যু হয়েছে অভিশপ্ত বা
লানতী মৃত্যু। সুতরাং তাঁর আস্তা উন্নীত হয়নি-‘রাফা’ লাভ করেনি’।
ইহুদীদের এই মিথ্যা ও কদর্য বিশ্বাসটাকে খণ্ডন করার জন্যই আল্লাহ
বলেছেন :

بِلْ رَفَعَهُ اللَّهُ لِأَيْنَهُ

‘বরং আল্লাহ তাকে তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন’।- এর ফলে,
একদিকে যেমন ঈসা (আঃ)-এর সত্যনবী হওয়া প্রমাণিত হয়েছে;
অন্যদিকে তেমনি, তাঁকে প্রথমে কতল ও পরে ক্রুশে লটকাবার অথবা
প্রথামে ক্রুশে লটকিয়ে পরে কতল করার ইহুদী ও খৃষ্টানদের দাবীগুলিও
মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যদিও, এ ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টানরা এখনও
পর্যন্ত সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে এবং জল্লনার অনুসরণ করে চলেছে।
এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের মৃত্যু পর্যন্ত এইরূপ বিশ্বাসই পোষণ করতে
থাকবে।

বলে রাখা ভাল যে,-

‘রাফা’ শব্দের অর্থ সশরীরে আকাশে উঠায়ে নেওয়া নয়। এই
শব্দটির অর্থ রূহানী উন্নতি দান করা বা আধ্যাত্মিকভাবে মর্যাদার উন্নীত
করা। যেমন আল্লাহকাম বলেছেন :

يَرْفَعَ اللَّهُ أَلَّا يَرْفَعَ مِنْكُمْ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ ‘রাফা’ দান
করবেন” -- (৫৮:১২)

হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি
আত্মনিবেদিত হয়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই রাফা দান করেন।” (সহিহ
মুসলিম : কিতাবুল ফাযাইল)। আমরা দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোয়ায়
‘রাফা’ শব্দের ব্যবহার করি। কিন্তু, কোথাও তো কেউ এই শব্দের অর্থ
সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠায়ে নিয়ে নেওয়া করি না।

আসলে, আল্লাহর দিকে মু'মিনের রাফা হয় মৃত্যু হলেই। এবং
এটাতো জানা কথাই যে, আল্লাহর দিকে রাফা দৈহিকভাবে হয় না, হয়
আত্মিকভাবে। এবং তা হয় মৃত্যুর পরেই। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন : “--
হে ঈসা ! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং আমার দিকে

তোমাকে উন্নীত করব' (৩ঃ৫৬)। এই আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঈসা (আঃ)-এর ওফাতের পর রাফা' হয়েছে। এখানেও ওফাং শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং ফালাম্বা তাওয়াফ্ফায়তানী'- আমাকে যখন তুমি ওফাং দিলে,- আয়াতেও 'ওফাং' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে; 'মউত' বা অন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তার কারণ হচ্ছে, 'ওফাং' অর্থ 'স্বাভাবিক মৃত্যু'- অস্বাভাবিক বা দুর্ঘটনা বা শাস্তি কবলিত মৃত্যু নয়। যেহেতু ইহুদী ও নাসারাদের দাবী হচ্ছে যে, ঈসা (আঃ)-কে কতল করে বা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর মৃত্যু ছিল এক অভিশপ্ত বা লানতী মৃত্যু, সেহেতু আল্লাহপাক 'ওফাং' শব্দ ব্যবহার করে বুঝায়ে দিয়েছেন যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, না তাঁকে কতল করা হয়েছে, না ক্রুশে দিয়ে মারা হয়েছে। এবং তিনি লানতী বা অভিশপ্ত হয়েও মৃত্যু বরণ করেননি। কাজই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে তাঁর আস্তার রাফা' হয়েছে আল্লাহর দিকে।' উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের 'মুতাওয়াফ্ফিকা'-এর অর্থ ইমাম বোধারী (রহঃ) করেছেন 'মুমিতোকা' - মৃত্যু দান করিব। কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করে যে, উক্ত আয়াতের 'রাফে উকা'- 'তোমাকে রাফা দিব'-কথাটি পরে পড়লে প্রমাণিত হবে যে, ঈসা (আঃ)-এর রাফা' আগে হয়েছে এবং ওফাং পরে হবে।

বলা বাহ্যিক, ধর্মগ্রন্থের কোন কথা আঙ্গপিচু করা, কোন কথা বাদ দেওয়া, কোন কথা জুড়ে দেওয়া, কোন শব্দ পরিবর্তন করা ইত্যাদি কাজগুলোকেই বলা হয় প্রক্ষেপন। প্রাচীন সব ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মানুষের এইরূপ হস্তক্ষেপ ঘটেছে। সেজনই ঐগুলিকে এখন গণ্য করা হয় বাতিল ধর্মগ্রন্থরূপে। কিন্তু পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে এই কথা খাটেনা। খাটে না বিশেষতঃ এই জন্য যে, আল্লাহ স্বয়ং কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব রেখেছেন নিজের উপরেই- (১৫:১০)। এ কারণেই, কোরআন করীমের মধ্যে মানুষের অনুরূপ হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং ব্যর্থ হয়েছেও। শর্তব্য যে, পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য আর কোন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে হেফাজতের অনুরূপ অঙ্গীকার আল্লাহর তরফ থেকে নেই। এই বৈশিষ্ট্য কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ।

উক্ত আয়াতে আল্লাহর কথা দুটি আগুপিচ্ছু করার মাধ্যমে তাদের আলেমরা বুঝাতে চান যে, আল্লাহ বলেছেন : ‘তোমাকে ওফাং দিব’—কাজেই ওফাং এখনও হয়ে সারেনি, ভবিষ্যতে হবে।

যদি তা-ই হয়, তাহলে তাদেরকে একথাও মানতে হবে যে, বলা হয়েছে : ‘তোমাকে রাফা’ দিব’—কাজেই ‘রাফা’ এখনও হয়নি ভবিষ্যতে হবে।

তারা বলবেন, ‘রাফা’ হয়ে যাওয়ার কথা বলা আছে অন্যত্র—‘বরং আল্লাহ তাকে তাঁর দিকে রাফা’ দিয়েছেন— এই আয়াতে। তাদেরকে তাহলে একথাও মানতে হবে যে, এবং না মেনে উপায়ও নেই যে, ‘ওফাং’ হয়ে যাওয়ার কথা বলা আছে অন্যত্র ‘ফালাস্মা তাও’ যাফ্ফায়তানি’

‘যখন তুমি আমাকে ওফাং দিলে’— এই আয়াতে। লক্ষ্যণীয় যে, এই শেষোক্ত আয়াতে তাদের আলেমরা ‘ওফাং’ শব্দের অর্থ করেন ‘জীবিত আকাশে উঠায়ে নেওয়া’— কিন্তু পূর্বোক্ত আয়াতে ‘ওফাং’ শব্দের অর্থ করেন ‘মৃত্যু হওয়া’। অথচ এই উভয় শব্দে উভয় ‘ওফাং’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঈসা (আঃ)-এর জন্যই। শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের এই নিখুঁত ও অনুপম ধারা ও পারম্পর্য কোরআনী ভাষার উৎকর্ষতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিগত চৌদশ’ বছর অন্যান্য ভাষার মত আরবী ভাষারীতিরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু তা কোরআনী রচনাশৈলীর সৌন্দর্যের কাছাকাছি পৌছুতে পারেনি। কাজেই, কেউ যেন কোরআনী ভাষার বাক্যগঠন, কথা, শব্দ, উচ্চারণ, বাগধারা প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা না করেন। কারণ, তাতে ফায়দা তো কিছু হবেই না, পরস্ত খোদার ক্রোধের শিকারে পরিণত হতে হবে।

যাহোক, এই সব আলেমরা ভেবে দেখেন না যে, ‘রাফেউকা’ শব্দটি আগে এবং ‘মৃত্যু’ যাফ্ফিকা’ শব্দটি পরে পড়লে অবস্থাটা কি দাঢ়ায়। উক্ত আয়াতে (৩:৫৬) আল্লাহত্তাআলা আরও বলেছেন :

- (১) “হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব,”
- (২) “এবং তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করব”

(৩) “এবং যারা অঙ্গীকার করে তাদের (দোষারোপ) থেকে
তোমাকে পবিত্র করব”

(৪) “এবং যারা অঙ্গীকার করে তাদের উপরে তোমার
অনুসারীদেরকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দিব।”

আমরা জানি, ঈসা (আঃ)-কে প্রদত্ত এই সব প্রতিশ্রুতির
প্রত্যেকটিই পূর্ণ করেছেন আল্লাহত্তাআলা। অর্থাৎ-

(১) আল্লাহত্তাআলা ঈসা (আঃ)-কে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করেছেন,

(২) অতঃপর, তাঁকে রহানীভাবে উন্নীত করেছেন,

(৩) অতঃপর, ইহুদীদের যাবতীয় জগন্য মিথ্যা দোষারোপ থেকে
তাঁকে মুক্ত করেছেন, এবং তাঁকে তাঁর যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন
হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর মাধ্যমে,

(৪) অতঃপর, তাঁর প্রকৃত অনুসারীদেরকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর
অনুবর্তিতার মাধ্যমেই প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর অঙ্গীকারকারীদের উপরে।
—এ সকল ঘটনাই প্রতিহাসিক সত্য। এখন, যারা আগে ‘রাফেউক’ এবং
পরে ‘মুতা’-ওয়াফ্ফিকা’ পাঠ করতে আগ্রহী তাদেরকে স্বীকার করতে
হবে যে, ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত ওফাতের প্রতিশ্রুতি যদি পূর্ণ
না হয়ে থাকে (তাদের বিশ্বাসমতে), তাহলে ঈসা (আঃ)-এর প্রতি
আল্লাহ প্রদত্ত অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগুলিও পূর্ণ হয়নি। অতঃপর, তাদেরকে
স্বীকার করতে হবে যে, কোরআন করীমের দ্বারা ঈসা (আঃ) ও তাঁর
মায়ের প্রতি আরোপিত জগন্য অপবাদগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। যদি
তা না হয়ে থাকে (নাউজুবিল্লাহ), তাহলে, কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তা
মিথ্যা প্রমাণিত হবার আর কোন উপায় নেই। অতএব, তাদের এই
বিশ্বাসটাই তাদেরকে আর একটা বিশ্বাসে উপনীত করবে যে, ঈসা
(আঃ)-এর মৃত্যু হবে কেয়ামতের পরে, পূর্বে নয়। তখন আল্লাহ প্রদত্ত
বাকী প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ণ হবে কেয়ামতের পরে। অতএব দেখা যাচ্ছে,
কোরআন করীমের কোন একটি কথার বা শব্দের সামান্য কিছু হেরফের
করলেও মানুষকে অঙ্গীকারে নিপত্তি হতে হয়।

হয়রত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ইন্দিকালের পরে হয়রত আবু বকর (রাঃ) যে আয়াতে করীমা তেলাওয়াৎ করে আসহাবে কেরাম (রাঃ)-কে নিশ্চিত করেছিলেন যে, আঁ হয়রত (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই আয়াতের ‘খালাত’ শব্দটি নিয়েও অনেকে আপত্তি করেন। তাঁরা বলতে চান যে, ‘খালাত’ অর্থ ‘অতীত হয়ে যাওয়া’—‘মারা যাওয়া নয়’। অতএব, ঈসা (আঃ) ‘আপাততঃ অতীত হয়ে গেলেও ভবিষ্যতে আবারও বর্তমান হবেন’। তাঁদের পক্ষে, কোন অতীতকে কোন ভবিষ্যতে চালান করে দিয়ে বর্তমান করা সম্ভব হবে কি না জানি না, তবে এটা জানি যে, ঐ ‘খালাত’ শব্দ ঐ আয়াতে শুধু ঈসা (আঃ) সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে রসূলে পাক (সাঃ)-এর পূর্ববর্তী সকল নবী রসূল সম্পর্কেই। অতএব, প্রশ্ন এই দাঁড়াবে যে, তবে কি অতীতে মৃত্যুবরণ করা সকল নবী-রসূলই পুনরায় জিন্দা হয়ে ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবেন সশরীরে ? আমরা জানি, আসবেন না।

তাছাড়া, ঐ ‘খালাত’ শব্দটি যেভাবে আঁ হয়রত (সাঃ)-এর বেলায় এসেছে, ঠিক তেমনিভাবে এসেছে ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও। আল্লাহত্তাআলা বলেছেন :

مَا أَنْتَ بِمَرِيْمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

“মরিয়মের পুত্র মসীহ ছিল কেবল এক রসূল; তার পূর্বে সকল রসূল মারা গিয়েছে”। (৫:৭৬)। অতীতকালের জাতিসমূহের গত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ‘খালাত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কোরআন করীমে।- (দ্রঃ ২৪:৩৫, ১৩:৩১, ৪১:২৬, ৪৬:১৮, ২২) পূর্বের উম্মতরা কি না মরেই গত হয়েছেন অথবা ‘খালাত’ বা গত হয়েও জীবিত আছেন ? অণিধানযোগ্য যে, আঁ হয়রত (সাঃ)-এর ওফাৎ সম্পর্কিত ঐ আয়াতে ‘খালাত’ শব্দটির পরপরই বলা হয়েছে—‘যে যদি মারা যায় বা নিহত হয়’। সুতরাং এই আয়াতেই ‘খালাত’ বা ‘অতীত হয়ে যাওয়া’-এর অর্থ প্রথম করা হয়েছে—‘মারা যাওয়া বা নিহত হওয়া’। কাজেই, কোরআন করীমে ‘খালাত’ শব্দটির অর্থ যা সাথে সাথেই করা আছে, তার বিপরীতে কোন অর্থ করা হঠকারিতা ছাড়া আর কি ? এ তো মানুষের কথা নয়, স্বয়ং আল্লাহর কালাম। মনে রাখা দরকার যে, কোরআনের উৎকৃষ্ট তফসীর

কোরআন নিজেই। এবং এই বিশেষত্বটি কোরআন মজীদের একটি অন্য বৈশিষ্ট্য, অন্য কোনও গ্রন্থেই এই বৈশিষ্ট্য নেই, দাবীও নেই।

আমরা আপাততঃ এই প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই হাদীসের এক বাণীর উক্তি দিয়ে। সাইয়েদনা হ্যরত রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

لَوْكَانْ مُوسَى وَ عِيسَى حَيَّتِينِ لَسَا وَ سَعْهُمَا إِلَّا اتَّبَاعِي

“যদি মূসা ও ইসা বেঁচে থাকতো, তাহলে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর থাকতো না” (তফ্সীর : ইবনে কাসীর)।

ঈসা (আঃ)-এর ‘নাযিল’ হওয়া

অতঃপর এই প্রশ্ন উঠবে এবং সঙ্গত কারণেই উঠবে যে, সহি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হ্যরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তার তাৎপর্য কি ?

অবশ্যই, এই প্রশ্নের জবাব থাকতে হবে, নইলে বিভ্রান্তিটা পুরোপুরি ঘূচবে না। এ প্রসঙ্গে যে হাদীসগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সেগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবন্ধ করতে চাই :

(১) বুখারী শরীফে আছে, হ্যরত রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

**كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ فِي كُمْ وَأَمَّا قَمْكُمْ مِنْكُمْ -
(بخاري باب نزول عيسى)**

‘তোমাদের অবস্থা কতই না সুন্দর হবে যখন ইবনে মরিয়ম নাযিল হবে তোমাদের মধ্যে এবং (সে) তোমাদের ইমাম হবে তোমাদের মধ্য থেকেই।’ (বাব-এ-ন্যুলে ঈসা)।

(২) মুসলিম শরীফে আছে : হ্যরত রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ فِي كُمْ فَأَمَّا قَمْكُمْ (مسلم كتاب الإيمان)

“কতই না সুন্দর হবে তোমার অবস্থা যখন ইবনে মরিয়ম নাযিল হবে তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের ইমামতি করবে।”— কিতাবুল ইমান। এই দুটি সহিত হাদীস থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হ্যরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আমাদের (উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার) মধ্যে নাযিল হবেন এবং আমাদের ইমামতি করবেন। অথচ, একথা যদি সত্য হয় (এবং তা অবশ্যই সত্য) যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন, তাহলে তাঁর পক্ষে পুনরায় নাযিল হওয়া সম্ভব হবে কিভাবে ?

দৃশ্যতঃ ব্যাপারটা জটিল। এবং এর জট খুলতেই হবে। নইলে কুসংস্কারের ঘন কুয়াশায় পথ হারাতে হবে। এ ব্যাপারে যে দুটি বিরুদ্ধ সম্ভাবনার দুয়ার খোলা থাকতে পারে, তা হচ্ছে :

(১) বনী ইসরাইলী নবী ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন, তিনি আসমান থেকে পুনরায় নাযিল হবেন পৃথিবীতে;

(২) বনী ইসরাইলী নবী ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। কাজেই, তিনি এবং উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আগমনকারী ঈসা (আঃ) একই ব্যক্তি নন, দুই উচ্চতের দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

এই দুটি পরম্পরবিরোধী সম্ভাবনা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো আলাদা আলাদাভাবে।

(১) বনী ইসরাইলী নবী ঈসা (আঃ) পুনরায় নাযিল হবেন। ‘নাযিল’ হয় উর্দ্ধ থেকে বা আকাশ থেকে। সুতরাং ঈসা (আঃ) আকাশ থেকেই নাযিল হবেন। আর যেহেতু তাঁর ‘নাযিল’ হওয়ার কথা আছে, সেহেতু তিনি আকাশে আছেন এবং জীবিত আছেন, এবং যেহেতু তিনি জীবিত আছেন, সেহেতু তাঁকে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠায়ে নেওয়া হয়েছে এবং সশরীরে।’— বলা বাহুল্য, ঈসা (আঃ)-এর জিন্দা থাকার যে বিশ্বাসটা সাধারণে প্রচলিত, তার পিছনের যুক্তি এটাই। এই যুক্তিটার প্রতিলক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, এর ভিত্তি মাত্র একটি শব্দ এবং শব্দটি হচ্ছে ‘নাযিল’।

বস্তুতঃ ‘নাযিল’ হওয়াটাই ‘আকাশে জীবিত উঠায়ে নেওয়ার’ ভিত্তি না হয়ে, বরং ‘আকাশে জীবিত উঠায়ে নেওয়াটাই’ ভিত্তি হওয়া উচিত ছিল ‘নাযিল হওয়ার’। কিন্তু, তা হয়নি। হয়নি কারণ ?

কারণ হচ্ছে,- ইসা (আঃ)-কে ‘জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে’ উঠায়ে নেওয়ার কথাটা না আছে কোরআন শরীফে, না আছে হাদীস শরীফে।

সমগ্র কোরআনের একটি মাত্র আয়াতের একটি মাত্র শব্দ ‘রাফা’-এর উপরে যথেষ্ট জল্লনা আরোপিত করে অর্থ করারও চেষ্টা করা হয়েছে- ‘সশরীরে আকাশে উঠায়ে নেওয়া’। কিন্তু তা যে ঠিক নয়, সর্বাংশে ভুল ও বিপ্রাপ্তিকর, সে আলোচনা আমরা করে এসেছি।

বাকী, হাদীসের কথা বলবেন? কিন্তু, আমরা জানি, সহিত হাদীস তো দূরস্থান, কোন জয়ীফ বা দুর্বল হাদীসেও ইসা (আঃ)কে সশরীরে আসমানে উঠায়ে নেওয়ার কথা নেই। আছেয়া, তা হচ্ছে ঐ ‘নাযিল’ হওয়ার কথা।

‘নাযিল’ শব্দ এসেছে মূল ‘নুয়ুল’ থেকে, সাধারণতঃ যার অর্থ করা হয় ‘অবতীর্ণ হওয়া’। কিন্তু, শুধু এই একটিমাত্র অর্থেই ব্যবহৃত হয় না ‘নুয়ুল’; বরং দানকরা, প্রেরণ করা, সৃষ্টি করা, আবির্ভূত করা প্রভৃতি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কোরআন করীমে। যেমনঃ

(ক)

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

“অতঃপর আল্লাহ তার রসূলের উপর নিজ প্রশান্তি নাযেল করলেন।” (১৪:২৬)
এখানে ‘নাযিল করা’ অর্থ ‘দান করা।

(খ)

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْفَجَرِ

“অতঃপর তিনি ঐ দুঃখের পরে তোমাদের উপর তন্ত্রারূপে প্রশান্তি নাযেল করলেন।” (৩: ১৫৫)

এখানেও ‘নাযিল করা’ অর্থ ‘দান করা।’

(গ)

وَأَنْزَلَ لَكُمْ قَنْ أَلَّا نَعَمِ شَنِينَيَّةً أَذْلَقُ

“এবং তিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুর্পদ জন্মসূচীর মধ্য হতে আট জোড়া নাযেল করেছেন।” (৩৯: ৭)

এখানে ‘নাযিল করা’ অর্থ ‘দান করা’ বা ‘সৃষ্টি করা।’

(ସ)

يَبْنِيَ أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ بِبَاءً

“ହେ ଆଦମ ସନ୍ତୋନଗଣ । ଆମରା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏମନ ପୋଶାକ ନାଯେଲ କରେଛି—” (୭ : ୨୭)

ଏଥାନେও ‘ନାଯିଲ’ ଅର୍ଥ ‘ଆସମାନ ଥେକେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ’ ନାହିଁ ।

(୯)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْإِنْزَانَ

“ନିଶ୍ଚଯ ଆମରା ଆମାଦେର ରସ୍ତଗଣକେ ସୁମ୍ପଟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଳୀରେ ପାଠିଯେଛି ଏବଂ ତାଦେର ସଙ୍ଗେ କିତାବ ଏବଂ ତୁଳାଦଣ ନାଯିଲ କରେଛି ” (୫୭ : ୨୬)

ଏଥାନେଓ କିତାବ ଓ ତୁଳାଦଣ ନାଯିଲ କରାର ଅର୍ଥ ଏ ନାହିଁ ଯେ, ଆସମାନ ଥେକେ ଛାପାନ କିତାବ ଓ ଦୌଡ଼ିପାତ୍ରା ନାମିଯେ ଦେଓଯା ହେଯେଛେ ବା ଏ ସବ ବସ୍ତୁରେ ରସ୍ତରା ଆସମାନ ଥେକେ ନେମେ ଏସେହେନ ।

(୧୦)

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

“ଏବଂ ଆମରା ଲୌହ ନାଯେଲ କରେଛି ।” (୫୭ : ୨୬) ଏଥାନେ ଲୋହ ନାଯିଲ କରାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀତେଇ ଲୋହା ସୃଷ୍ଟି କରା ।

(୧୧) **قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩ رَسُوْلًا يَتْوَعَّدُونَ عَلَيْكُمْ
أَيْتَ اللَّهُ مُهِبِّيَّنَتٍ**

ଆଜ୍ଞାହୁ ନିଶ୍ଚ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ନାଯିଲ କରେଛେନ ଏକ ଶାରକ-ରସ୍ତା ଯେ ତୋମାଦେର ନିକଟ ଆଜ୍ଞାହୁର ସୁମ୍ପଟ ଆୟାତସମୂହ ଆବୃତ୍ତି କରେ- ।” (୬୫:୧୧,୧୨) ।

ଏହି ଆୟାତେ ସାଇଯେଦନା ରସୁଲେ ପାକ (ସା:)-କେ ନାଯିଲ କରାର କଥା ବଲା ହେଯେଛେ । ଏବଂ ଆମରା ସବାଇ ଜାନି ଯେ, ଆହ୍ସରତ (ସା:) ଆସମାନ ଥେକେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହନନି । ତିନି ଜନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେଛେନ ମାଟିର ପୃଥିବୀତେ । ଏବଂ ଏହି ମାଟିର ପୃଥିବୀତେଇ ତିନି ଓଫାତ ପ୍ରାଣ ହେଯେଛେ । ଏରପରେଓ କେଇ ଯଦି ହାଦୀସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଇବନେ ମରିଯମ୍ରେ ନାଯିଲ’ ହେଉୟାକେ କୋରାଆନେର ନିୟମ ନୀତି ଭଙ୍ଗ କରେ ତାର ସଶରୀରେ ଆକାଶ ଥେକେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉୟା ବୁଝେନ ତାହଲେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ବ ତାଁର, ଆମାଦେର କରାର କିଛୁ ନେଇ ।

হাদীসে দুই ঈসা (আঃ)

রসূলে পাক রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ)-এর রহমতের সীমা পরিসীমা কোন ফেরেশ্তা জানে না, মানুষে জানে না -এক খোদা ছাড়া। স্বীয় উম্মতের উপরে তাঁর বেইত্তেহা রহমের আদ্বাজ করাও আমাদের মত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর রহমত অন্তহীন। ভবিষ্যৎ উম্মতের সম্ভাব্য বিভাসির কথা ভেবে তিনি এক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন। সেই পবিত্র দিক-নির্দেশনা যারা অগ্রাহ্য করবে তাদের জন্য আল্লাহর পানাহ চাই।

উম্মত যাতে ‘মুসায়ী মসীহ’ ও ‘মুহাম্মদী মসীহ’ এর নাম বা উপাধির সাদৃশ্য দেখে বিভাস্ত না হয় এবং সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে, তজ্জ্ঞ তিনি (সাঃ) এমন দুটি বিশেষ হেদায়াত দান করে গেছেন যার প্রতি একটু ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি দিলেই বিভাসি ও নিরুদ্ধিতার যাবতীয় কুয়াশা অপস্থত হয়ে যায়, এবং প্রভাতসূর্যের ন্যায় সত্য দেবীপ্যমান হয়ে ওঠে। এর একটি হলোঃ কেয়ামতের দিনে আল্লাহর সমীপে প্রদত্ত ঈসা (আঃ)-এর জবানবন্দীঃ

‘‘যখন আমাকে তুমি ওফাই দিলে, অতঃপর তুমই ছিলে তাদের উপরে তত্ত্বাবধায়ক’।—(৫:১১৮)

যে জবানবন্দীকে আহ্যরত (সাঃ) নিজের জন্য ব্যবহার করে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, ঈসা (আঃ)-এর উফাই অর্থাৎ ‘স্বাভাবিক মৃত্যু’ ঘটে গেছে। এই বিষয়টি আমরা আলোচনা করে এসেছি। অপর হেদায়াত হলোঃ প্রথমে আগমনকারী ও শেষে আগমনকারী উভয় ঈসা (আঃ)-এর হলিয়া সংক্রান্ত। মানুষকে তিনি আমরা দৈহিক চেহারার মাধ্যমে। মানুষের আত্মিক বা আত্মস্তুরীণ চেহারা মানুষে দেখে না, দেখতে পায়না। একই নামের কতিপয় ব্যক্তিকে আমরা সনাক্ত করতে পারি পৃথকভাবে কেবল তাদের স্ব স্ব চেহারা-সুরতের মাধ্যমে। ভবিষ্যৎ উম্মতের লোকেরা যাতে বনী ইসরাইলী নবী ঈসা (আঃ)-কে এবং মুহাম্মদীয় উম্মতের নবী ঈসা (আঃ)-কে এক ও অভিন্ন

ব্যক্তি মনে না করে, তজ্জন্য আহ্যরত (আঃ) দয়া করে, উভয় ইসার (আঃ) হলিয়া বর্ণনা করে গেছেন। এই বর্ণনা দুই আলাদা ব্যক্তির দুই আলাদা হলিয়া।

বনী ইসরাইলী নবী ইসা (সাঃ)-এর চেহারার বর্ণনায় আহ্যরত (সাঃ) বলেছেনঃ “আমি ঈসা, মুসা ও ইব্রাহিমকে দেখেছিঃ ঈসা ছিলেন লাল-ফর্সা, কোঁকড়ান কেশ, প্রশস্ত বক্ষ” - (বুখারী);

মুহাম্মদী উম্মতে আগমনকারী নবী ঈসা (আঃ)-এর চেহারার বর্ণনায় আহ্যরত (সাঃ) বলেছেনঃ-

‘সুদৰ্শন, গন্দমবর্ণ ঘাড়পর্যন্ত লম্বা চিরুনী করা সোজা কেশ,...’ - (বুখারী ও মুসলিম)।

এই দুই হলিয়ার বর্ণনা স্পষ্টতঃই দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এবং এই উম্মতে আগমনকারী ব্যক্তি যে বনী ইসরাইলী ঈসা (আঃ) নন, স্বতন্ত্র বা পৃথক চেহারাই তার প্রকাশ্য প্রমাণ। স্পষ্টতঃ একজনের কেশ কৌকড়া, অপজনের কেশ সোজা বা সরল। গায়ের রঙও আলাদা।

ঈসা (আঃ)-এর জন্মকথা

অতঃপর বেশী চালাক লোকেরা এই তর্ক তুলেন এবং বলেন যে, ঈসা (আঃ) অন্য সব মানুষের ন্যায় মাত্রগতে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁর জন্ম হয়েছে বিনা পিতায়। কাজেই, তাঁর জন্ম ছিল অলৌকিক। অতএব, তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারেও অলৌকিকত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু এই লোকগুলো হ্যরত আদম (আঃ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে অনুরূপ কোন আলৌকিকত্ব আরোপ করেন না, যদিও তাদেরই বিশ্বাস মতে আদম (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল বিনা পিতায় এবং বিনা মাতায়।

আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, প্রকৃতিতে লতা-গুল্য বা উদ্ধিদের উৎপাদন হয় একাধিক প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law) এর আওতায়। সাধারণভাবে বীজ থেকেই উদ্ধিদের উৎপাদন বা বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে। কিন্তু এছাড়াও

এক্ষেত্রে কিছু বিরল নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কলাগাছ, বাঁশ ইত্যাদির উৎপাদন ঘটে শিকড় থেকে, পাথরকুচির বংশবৃক্ষ ঘটে পাতা থেকে। এগুলি বিরল নিয়ম। অপুংজনি (Perthenogenesis) প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ স্ত্রী ও পুঁ এর মিলন ছাড়াই বহু উদ্ভিদের বংশবৃক্ষ ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কোন কোন প্রাণীরও বংশবৃক্ষ ঘটে। অপুংজনি প্রক্রিয়া অধুনা উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞানে একটি পরীক্ষিত প্রমাণিত বিষয়। তবে, অপুংজনি প্রক্রিয়ায় মানবের বংশবৃক্ষ ঘটে কিনা তা এখনও সন্দিক্ষিত নয়। অবশ্য, এরূপ সম্ভাবনাকে কোনও বিজ্ঞানী নাকচ করে দেন না। তদুপরি, প্রাকৃতিক নিয়মের সব কিছুই মানুষ জেনে ফেলেছে এমন কথা কেউ বলবেন না। আল্লাহর সৃষ্টির কতটুকু রহস্যই বা মানুষ উন্মোচন করতে পেরেছে। তাই বলা যায়, হয়রত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর জন্মের ঘটনাটি এমন এক Natural Law বা প্রাকৃতিক নিয়ম সম্মত যা একটি বিরল নিয়ম এবং যে সম্পর্কে প্রাণিবিজ্ঞান আজও পূর্ণরূপে অবহিত নয়। সুতরাং বিনা পিতায় জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি কোন অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। এটিও খোদাতায়ালার সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মেরই আওতাধীন, তবে সেই নিয়ম সাধারণ নয়, বিরল।

মানুষের জন্ম সংক্রান্ত নিয়মের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

“এবং আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর আমরা উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে রাখিয়া দিলাম।” (২৩:১৩, ১৪)। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বিশেষ অবস্থাধীনে যৌন সংসর্গ বা পুরুষের সহমিলন ব্যতিরেকেও শুক্রাণু যথাযথ অবস্থা ও নিরাপদ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে তথা গর্ভাশয় বা অন্য কোন উপর্যুক্ত ব্যবস্থা থাকলেও সম্ভাব্য জন্ম নিতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলে যে, কোন কোন নারীর গর্ভাশয়ে বা নিরাশের ভেতরে কখনও কখনও এক প্রকার টিউমার দেখা দেয়, যার নাম ‘আরেনোব্লাস্টোমা’ (Arrenoblastoma)। এই টিউমার পুরুষ শুক্রাণু উৎপাদন করতে সক্ষম। এইরূপ শুক্রাণুর উৎপাদনে কুমারীও গর্ভধারণ করতে পারে এবং করেও। বিনা

পিতায় হ্যরত ইসা (আঃ)-এর জন্মও খুব সম্ভব এইরূপ এক বিরল প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকবে। বাইবেলে বর্ণিত আছে সম্মাট সিদ্ধক সালেম বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চেঙ্গিজ খানও বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। অতএব, ইসা (আঃ)-এর বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করাটা কোন প্রথম ও অদ্বিতীয় ঘটনা নয়। (বিস্তারিত দেখুনঃ এনসাই, ব্রিটানিকাঃ ভার্জিন বার্থ (Virgin Birth); এবং 'এনোমালিজ এণ্ড কিউরিওসিটিজ অব মেডিসিন'- "Anomalies and Curiosities of Medicine" Published by W.B. Saunders & CO. 'London').

'হ্যরত ইসা (আঃ)-এর জন্ম বিনা পিতায় হয়েছে' - এই তথ্যে আমদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমরা বিশ্বাস করি বিশেষতঃ এই জন্যে যে, স্বয়ং আল্লাহই মানুষকে জানিয়েছেন এই তথ্য কোরআন করীমের মাধ্যমে। আল্লাহ যা বলেছেন আমরা তাই বিশ্বাস করি নি:সংশয়ে। বলা বাহ্য, আমরা কোরআন করীম থেকে প্রমাণ করে এসেছি যে, ইসা (আঃ)-কে না কতু করে, না ক্রুশে বিন্দ করে হত্যা করা হয়েছে, বরং তাঁর মৃত্যু হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে। সুতরাং এই ঐশ্বী সংবাদের বিপরীতে যাঁরা তাঁর ওফাতের ব্যাপারে অথবা অলৌকিকত্বের সন্ধান করতে চান তাঁরা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবেন এবং আখেরে তাঁদেরকে খোদাতায়ালার সমীপে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ যেভাবে বলেছেন ইসার (আঃ) জন্ম হয়েছে বিনাপিতায়, তেমনিভাবে আল্লাহই বলেছেন ইসার মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, অতএব তা সত্য।

‘ইসা’ বা ‘ইবনে মরিয়ম’ নাম বা উপাধি

অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে এবং জাগেও যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আগমনকারী মহাপুরুষ যদি বনী ইসরাইলী নবী ইসা মসিহ ইবনে মরিয়ম না-ই হন, তবে তাঁকে ঐ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, প্রথমতঃ-

ঈসা বা ইবনে মরিয়ম নাম ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে,— উপমাস্তুরূপ শুণগত সাদৃশ্য বোঝানোর উদ্দেশ্যে। যেমন, কেউ যদি বলেন, ভুলু পাহলোয়ান বর্তমান যামানার রন্ধন; কিংবা হাজী মুহম্মদ মুহসীন একজন হাতেম তাই, তাহলে, তাঁকে কি কেউ দোষ দিবেন? দিবেন না। কেননা, এই জাতীয় উপমা ও রূপকের ব্যবহার ভাষা ও সাহিত্যের একটা সর্বজনস্বীকৃত রীতি। সুন্দর রচনাশৈলীর জন্য যার প্রয়োজন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ—

কোরআন করীমে এবং হাদীস শরীফে ‘মরিয়ম’ ও ‘ইবনে মরিয়ম’ নাম দুটি শুণবাচক নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মুমিনের জন্য উপমা স্বরূপ, রূপকার্থে। যেমন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ أَمْنَوا امْرَأَ فَرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عَمْرَانَ

“এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহু ফেরাউনের স্ত্রীকে উপমাস্তুরূপ বর্ণনা করেছেন……”

এবং ইমরানের কল্যান মরিয়মকে “……” (৬৬:১২,১৩)।

এই আয়াত দু'টিতে আল্লাহতায়ালা ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়াকে এবং ঈসা (আঃ)-এর মাতা বিবি মরিয়মকে (আঃ) মুমিনের উপমা হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং পূর্ববর্তী আয়াতে অস্বীকারকারীদের তুলনা দিয়েছেন নৃহ (আঃ) ও লৃত (আঃ)-এর স্ত্রীদের সঙ্গে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে,— হযরত রসুলে আকরাম (সাঃ) বলেছেনঃ “মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম ব্যতীত প্রত্যেক আদম সন্তানকেই জন্মিবার সময়ে শয়তান স্পর্শ করে, সেই জন্য সে চীৎকার করেউঠে।”— (সর্বসম্মত)।

এই হাদীসের তাৎপর্য অতিশয় সুস্পষ্ট। যেমন, আল্লামা জমখশারী (রঃ) লিখেছেন যে, এই হাদীসের ‘মরিয়ম’ ও ‘ইবনে মরিয়ম’ শব্দের অর্থ-প্রত্যেক ‘সাধু ব্যক্তি’ যিনি মরিয়ম ও ইবনে মরিয়মের শুণে শুণাবিত। সুতরাং বলা

নিষ্পত্তিযোজন যে, উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আগমনকারী মহাপুরুষকে ইবনে মরিয়ম বা ঈসা বলা হয়েছে উপমাবরূপ। সাধারণে প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে— বনী ইসরাইলী নবী হ্যরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) পুনরায় একবার আসমান থেকে নাযিল হবেন, যদিও এ কথাটা না আছে বাইবেলে, না কোরআন মজীদে, না হাদীস শরীফে; এবং একথাটাও কোরআন-হাদীসের কোথাও নেই যে, ঈসা (আঃ)কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে তুলে নেওয়া হয়েছে আসমানে। আসলে, এই জাতীয় বিশ্বাস ধর্ম-বিরোধী এবং ধর্মীয় ইতিহাস বিরোধী। ধর্মগ্রন্থে এবং ধর্মীয় ইতিহাসে এরূপ বিশ্বাসের উল্লেখ কোথাও নেই যে, কোন নবীকে কখনও জীবিত বা সশরীরে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে হাঁ, এই জাতীয় বিশ্বাসের কথা থাকতে পারে প্রক্ষেপে, গল্পে, উপকথায় বা ছেলে ভুলানো রূপকথায়। পরিতাপের বিষয় এই যে, অজ্ঞতার এবং কুসংস্কারের অঙ্গকার যখন জল ও স্থল তথা মানুষের মন ও মন্তিককে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন ঐ জাতীয় কেছু-কাহিনীতেও বিশ্বাস স্থাপন করে মানুষের। মানুষের এরূপ অঙ্গকার ও মোহাচ্ছন্ন পতিত অবস্থায় আল্লাহ তাদের পরিত্রাণের জন্য তখন তাদের মধ্য থেকেই নবী উঠিত করেন। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকার কারণে মানুষ সেই নবীকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিরোধিতায় লিঙ্গ হয়। মানব চরিত্রের এই চিরগতানুগতিক অবস্থাটার দিকে, ইঙ্গিত করে কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ

يَحْسَنُ عَلَى الْعَبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِنَّمَا يَنْهَا دُنْ

‘পরিতাপ! বাল্দাদের জন্য, তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসেনি, যার প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি’ (৩৬:৩১)। কোরআন করীম পাঠে জানা যায়, ধর্মের ইতিহাসে বার বার এই ঘটনা প্রত্যাবর্তন করেছে যে, বরাবর মানুষ সমাগত নবীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, নবীর প্রতি জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে। যেমনঃ— অবিশাসীরা হ্যরত নূহ (আঃ)কে বলেছিলঃ

‘হে নূহ! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তাহলে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত ব্যক্তিদের অস্তর্ভুক্ত হবে।’ (২৬:১১৭)।

অবিশ্বাসীরা হয়রত ইব্রাহিম (আঃ) সম্পর্কে বলেছিলঃ

‘তোমরা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মার এবং নিজেদের উপাস্যদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা বাস্তবিকই কিছু করতে চাও।’ (২১:৬৯)।

বস্তুতঃ প্রত্যেকে নবীর ক্ষেত্রেই এই অবস্থা পুনরাবর্তিত হয়েছিলঃ এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা তাদের রসূলদেরকে বলেছিল ‘আমরা তোমাদেরকে নিশ্চয় আমাদের দেশ থেকে বহিক্ষার করে দেব, অথবা, তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরে আসবো’ (১৪:১৪)।

তাই ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় যে, অবিশ্বাসীদের জুলুম-নিপীড়ন থেকে হিজরত করে অন্যত্র বা অন্য দেশে চলে যাওয়াটা নবী রসূলগণের এক চিরাচরিত সূন্ত। অন্যকথায়, প্রত্যেক নবীরসূলই তাঁর সমসাময়িক লোকদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। এবং এইরূপ নির্যাতন ও নিপীড়ন সর্বাপেক্ষা বেশী হয়েছিল হয়রত রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ)-এর উপরে। অথচ, এর ঠিক উল্টোটা বিশ্বাস করা হচ্ছে ইদানিং, এবং ইতিহাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে যে, হয়রত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং তাঁকে সমকালীন জনগণ সমবেতভাবে সাদর সমর্থনা জ্ঞাপন করে বরণ করে নেবে। কীআক্র্য!

হয়রত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, তাঁর উম্মতের অবস্থাও একসময় ইহুদীদের মত হবে। হজুর (সাঃ)-এর এই কথা থেকে আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, মুসলমানরা আখলাকে আচরণে ইহুদীদের মত হবে। কিন্তু মুসলমানরা যে আকিন্দার ক্ষেত্রেও অনেকাংশে ইহুদীদের মত হয়ে পড়বে, এই কথাটা আমরা চিন্তা করি না। ইহুদীরা যে হয়রত ঈসা (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যন করেছিল এবং তাঁর উপরে জুলুম চালিয়েছিল তার একটা প্রধান কারণ এই ছিল যে, ইহুদীরা তখন বিশ্বাস করতো এবং এখনও করে যে, ইলিয়াস (আঃ) (ইদরিস বা এলীজা) এক ঘূর্ণিবাত্যায় সশরীরে স্বর্ণে চলে গেছেন (রাজাবলী,

২য় অধ্যায়) এবং তিনি আবার সশরীরে পৃথিবীতে নেমে আসবেন ইসা (আঃ)- এর আবির্ভাবের পূর্বে। কাজেই, ইলিয়াস নবীর সশরীরে পুনরাগমনের পূর্বে ‘ঈসা মসীহ’ এর আগমন হতে পারে না। এই বিশ্বাসটা ইহুদীদের মধ্যে তখনও ছিল এবং এখনও আছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, ঠিক অনুরূপ একটা ইহুদী-বিশ্বাসও এই যামানার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, ঈসা (আঃ) সশরীরে আসমান থেকে নেমে আসবেন, অতঃপর ইমাম মাহুদী (আঃ) জাহির হবেন। অথচ, প্রকৃত সত্য এটাই যে, না ইলিয়াস (আঃ) সশরীরে স্বর্গে বা আসমানে গেছেন, না ঈসা (আঃ)। বরং ঈসা (আঃ) ইহুদীদের ঐ কল্পিত বিশ্বাসটাকে বাতিল প্রমাণিত করে বলেছিলেন যে, এলিয়াস বা এলীজায় আগমনের যে কথা ছিল তা পূর্ণ হয়েছে জন দি ব্যাপটিষ্ট বা ইয়াহিয়া নবীর (আঃ) আগমনের মধ্য দিয়ে—(মধ্যি, ১৭ অধ্যায়)।

কাজেই, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করে, সেগুলির হৃষে আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় সেদিন ইহুদীরা যেমন বসেছিল এবং এখনও বসে আছে, তেমনি বসে আছে এই যামানার মুসলমানরাও। এবং এই আকিদাগত সাদৃশ্যটার কারণেও হ্যরত রসূলে আকরাম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, মুসলমানরাও এক সময় ইহুদীদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহর রসূলের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তাঁর সুনির্মল সত্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতএব সত্য এটাই যে, ইহুদীদের মধ্যে আগমন করেছিলেন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) নামে এক নবী এবং ‘ইহুদী-সদৃশ’ এই যামানার মুহাম্মদী উচ্চতের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ার কথা ‘ঈসা ইবনে মরিয়ম-সদৃশ’ এক নবীর (আঃ)। এবং এই সাদৃশ্যের প্রধান কারণ এই যে, উভয়েই তাঁদের স্ব স্ব গুরু নবীর শরীয়তের তস্মীককারী এবং পুনঃ প্রচারকারী। এবং উভয়েরই আবির্ভূত হওয়ার সময় তাঁদের পূর্ব শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবীর তের শত বৎসর পরে। এক কথায় যে উচ্চত ‘ইহুদী-সদৃশ’ তাঁর নবীও ‘ঈসা-সদৃশ’।

যিনি মাহুদী তিনিই ঈসা (আঃ) এবং ক্রুশভঙ্গকারী

আমরা একথা নিঃসংশয়ে বলতে চাই যে, শেষ যামানায় উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে যে মহা সংক্ষারকের আগমনের কথা, তাঁকে যেমন ‘ইমাম মাহুদী’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তেমনি ‘ঈসা ইবনে মরিয়ম’ও তাঁর এক উপাধি বা উপমাসূচক নাম। এই দুই উপাধি দুই স্বত্ত্ব ব্যক্তির নয়, একই ব্যক্তির। অন্যকথায়, যিনি মাহুদী তিনিই ঈসা (আঃ)। বিষয়টি পরিকার করে বলা হয়েছে ইবনে মাজা’র এক হাদীসে। হ্যরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا يَهُدِّي إِلَّا عِيسَى بْنُ مَرْيَمُ (ابن ماجه باب شدة الزمان)

—“নেই মাহুদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যক্তিত।”

অতএব, যিনি ঈসা ইবনে মরিয়ম তিনিই ইমাম মাহুদী (আঃ)। এবং তিনি জন্ম গ্রহণ করবেন,— জন্ম গ্রহণ করবেন উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে, অন্য কোন পৃথিবীর উচ্চতের মধ্যে নয়। আখেরী যামানায় আবির্ভাবের পর তাঁর যা কাজ হবে তা হাদীস শরীকে বলা আছে এই ভাবেঃ

بُوْشَكَ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِمَامًاً مَهْدِيًّا حَكَمَ
عَدَ لَا فِي كِسْرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتَلُ الْغَنْزِيرَ وَيَصْبِحُ الْحَرْبَ (مسند الحسن بن حنبيل)

“তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমামরূপে, মাহুদীরূপে, হাকামরূপে, আদেলরূপে। তিনি ক্রুশভঙ্গ করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং যুদ্ধ রাহিত করবেন।” (মুসনাদঃ আহমদ বিন হাবল)। এই হাদীসে আহ্যরত (সাঃ) অতি পরিকার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, যিনি ঈসা তিনিই ইমাম মাহুদী, তিনিই যামানার জন্ম হাকেম ও আদেল-মীমাংসাকারী, ন্যায়বিচারক। তাঁর অন্য সব কাজের মধ্যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে ‘ক্রুশভঙ্গ’ করা।

আমরা এখন জানতে চাইব যে, আহ্যরত রসুলে পাক (সাঃ) ‘কুশতঙ্গ’
বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন।

‘কুশতঙ্গ’ করার অর্থ কি এই যে, খৃষ্টানরা দুনিয়াময় যে অজন্ম অগণিত
কুশচিহ্ন (+) তৈরী করেছে, এবং ভবিষ্যতেও করবে, এমনকি মেঘেদের
গয়না-পাতি, নেইল-কাটার প্রভৃতির গায়ে পর্যন্ত, সেগুলিকেই ভেঙ্গে চূর্মান
করে ফেলা? না, তা নয়, তা হতে পারে না। কোন ধর্মপুরুষ মহামানব এমন
ধরণের কাজ করতে আবির্ভূত হন না। এই পবিত্র হাদীসের ‘কুশতঙ্গ’ কথাটির
অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে, ‘কুশীয় ধর্মমত’কে মিথ্যা প্রমাণিত করা, আর এই
কুশীয় ধর্মমত হচ্ছে, প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম।

প্রচলিত খৃষ্টধর্মের মূল আকিদা বা ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে- খোদা তিন জন।
এক- স্বষ্টা বা পিতা-খোদা; দুই-যীশু, যিনি পুত্র-খোদা; এবং তিন-
জিবাস্তু বা পবিত্রাত্মা খোদা কিংবা সতী সাধী মরিয়ম।

খৃষ্টধর্মের অপর প্রধান আকিদা হচ্ছেঃ ‘পুত্র-খোদা’ যীশু ক্রুশে বিন্দ হয়ে
রক্তদান করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর সেই রক্তে পূর্বাপর প্রত্যেক
আদম সন্তানের পাপ-মুক্তি ঘটবে এবং তার পরিত্রাণ লাভ হবে। আদম (আঃ)
বেহেশ্তে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে পাপ করেছিলেন, তাঁর সেই পাপ উরসসূত্রে
পুরুষানুক্রমে আদম-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং
চলবেও কোয়ামত পর্যন্ত। সেই ‘আদিপাপ’ ও অন্যান্য যাবতীয় পাপ থেকে
আদমসন্তানকে পরিত্রাণ দানের জন্য পুত্র-খোদা যীশু ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে
সার্বজনীন ও সর্বকালীন প্রায়শিত্ব করে গেছেন। অতএব, মানুষ যতখুশী পাপ
করবুক না কেন, তাতে কিছু যাবে আসবে না, শুধু ক্রুশবিন্দ যীশুতে ও তাঁর
রক্তে বিশ্বাস স্থাপন করলেই চলবে। তাহলেই, তার কোন বিচার হবে না শান্তি
হবেনা, সে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।’

‘তাছাড়া যীশু যেহেতু খোদার একমাত্র জাত-পুত্র, পুত্র-খোদা, সেহেতু
মৃত্যু মাত্র তিন দিন তাঁকে কাবু রাখতে পেরেছিল। অতঃপর, তিনি পুনর্জীবিত

হয়েছেন এবং আপন পিতার সমিধানে আসমানে উঠে গেছেন। শেষ যুগে তিনি
পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং এই ধুলির ধরণীতে তাঁর পিতার
স্বর্গরাজ্য স্থাপিত করবেন, যে রাজ্য তিনি প্রথমবারে স্থাপিত করতে পারেননি
ইহুদীদের ভয়ে।

এটাই হলো, সংক্ষেপে, ‘ক্রুশীয়’ ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস যীশুখ্টের
প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিশ্বাসটা ছড়িয়েছে পৌল বা
সেন্ট পল নামক এক বৃক্ষি যার সঙ্গে না দেখা হয়েছিল যীশুর, না সে বয়াত
বা দীক্ষা নিয়েছিল যীশুর পবিত্র হাতে। যীশু না শিক্ষা দিয়েছিলেন খোদার
পুত্রত্বের, না তিনি কখনও দাবী করেছিলেন যে, তিনি খোদার পুত্র। না তিনি
ক্রুশে অভিশঙ্গ মৃত্যু বরণ করেছেন, না তিনি আসমানে উঠে গেছেন। বরং তিনি
মারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে পরিণত বয়সে। সুতরাং প্রচলিত খৃষ্টধর্মের
বিশ্বাসটা সম্পূর্ণ খৃষ্ট-বিরোধী (Anti-Christ); এইজন্য পাচাত্যের কোন
কোন ঐতিহাসিক প্রচলিত খৃষ্টধর্মকে আখ্যায়িত করেছেন (Paulian)
পৌলীয়ন ধর্মবিশ্বাস বলে। এই বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটেছে প্রধানতঃ Cross বা
ক্রুশকে কেন্দ্র করে। তাই ‘ক্রস’ কেন্দ্রিক এই বিশ্বাসটাকে জর্জ বার্নার্ড শ’
বলেছেন ‘ক্রস্চিয়ানিটি’। এই যে ‘ক্রস্চিয়ানিটি’ যাকে খৃষ্টিয়ানিটি বলে
চালানো হচ্ছে, তাকে মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণিত করাই হচ্ছে ‘ক্রুশভঙ্গ’ করা।
এবং এটাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে ‘ক্রুশভঙ্গ’ করা তা পাচাত্যের দার্শনিকরাও
মানতেন। এজন্যই, বার্টার্ড রাসেলের ‘Why I am not a Christian’
পুস্তকের প্রচ্ছদে তাঙ্গা ক্রসের একটি প্রতীকী ছবি ছাপানো হয়েছে (১৯৬৭
সংক্ষরণ)। এক কথায় ক্রুশ ভঙ্গ করার অর্থ হলো প্রচলিত খৃষ্টধর্মের বিশ্বাস
গুলিকে বাতিল ও মিথ্যা প্রমাণিত করা। এবং তা সম্ভব হবে তখনই যখন
প্রমাণিত হবে যে, যীশু খোদার পুত্র ছিলেন না। কেননা, খোদার কোন পিতা
বা পুত্র নেই। যীশু ক্রুশে প্রাণত্যাগও করেন নি। তাঁর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ
লাভও অসম্ভব। এবং ঐ সকল বিশ্বাসই অযৌক্তিক ও অপবিত্র।

খোদার পুত্রত্বের অলীক ও লৌকিক বিশ্বাসটা সম্পর্কে কোরআন মজীদে
বলা হয়েছে:

وَقَالُوا اتَّعْذِذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا١٩١ لَقَدْ جَسْمَ شَيْئًا إِذَا١٩٢
تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ هَذَا١٩٣
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا١٩٤

“এবং তারা বলে, ‘রহমান আল্লাহ নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেছেন।’
নিচয়, তোমরা এক অতি শুরুতর কথা বলছ। আকাশসমূহ ফেটে যাবার ও
পৃথিবী বিদীর্ণ হবার এবং পর্বতমালা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে যাবার উপক্রম
হয়েছে। কারণ তারা রহমান আল্লাহর প্রতি পুত্র আরোপ করেছে।” (১৯:৮৯-৯২)

এই ভয়ানক, এই জাল বিশ্বাস যারা প্রচার করে তারাই দাঙ্গাল। এই
দাঙ্গালের ভয়াবহ ফিনার কথা বলার সময় আসছাবে কেরামের কেউ কেউ
রসূলে পাক (সা:)—এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, দাঙ্গালের ভীষণ
ফেনা থেকে মানুষ বাঁচবে কী করে। তখন, রসূলে পাক (সা:) বলেছিলেন,—
যারা সুরা কাহাফের প্রথম ও শেষ দশ আয়াত তেলাওৎ করবে তারা
দাঙ্গালের ফেনা থেকে বেঁচে যাবে। বলা প্রয়োজন যে, সুরা কাহাফের প্রথম
দশ আয়াতের মধ্যেই আছে :

وَيَنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّعْذِذَ اللَّهُ وَلَدًا١٩٥ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لَيْلَابِهِمْ
كَبُرُّتْ كُلِّهُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبًا١٩٦

এবং যেন ইহা ঐ সকল লোককে সতর্ক করে, যারা বলে ‘আল্লাহ এক
পুত্র গ্রহণ করেছেন।’ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের
পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। ইহা অত্যন্ত জগন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে
নিস্তৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে। (১৮ : ৫, ৬)

এবং এই জগন্য, এই মিথ্যা মতবাদ প্রচারকারী খৃষ্টান পাদ্বীরা বিগত
শতাব্দীতে এত বেশী বেঁড়ে গিয়েছিল যে, তারা সদস্তে প্রচার করতে শুরু
করেছিল :

- (ক) আফ্রিকা মহাদেশ তাদের কুক্ষিগত;
- (খ) ভারতে মুসলমান বলতে একজনও থাকবে না;
- (গ) মুক্তায় খৃষ্টান ধর্মের পতাকা উত্তোলনের সময় আসব।

দূর্ভাগ্যজনক হলেও এটা এক ঐতিহাসিক সত্য যে, পাদ্রীদের সেই দণ্ড
স্ফেক ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। সে সময়ে ব্রিটিশ-খৃষ্টানদের রাজস্বকালে
ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য ধর্মের মানুষ ও
সাধারণ মুসলমানদের কথা তো দূরস্থান, বহু বড় বড় আলেমও পাদ্রীদের সাথে
তর্কে পরাজিত হয়ে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। তাদের খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার প্রধান
কারণ ছিল তাদের মধ্যে প্রচলিত কিছু বিশ্বাস। যে বিশ্বাস মতেঃ—

- (ক) ইস্রা (আঃ) অদ্যাবধি আকাশে জীবিত আছেন ;
- (খ) তিনি আখেরী যামানায় সশরীরে পৃথিবীতে নেমে আসবেন ;
- (গ) তিনি মৃতকে জিন্দা করতে পারতেন ;
- (ঘ) তাঁর স্পর্শে অন্ধ দৃষ্টি লাভ করতো; ব্যাধিগ্রস্ত আরোগ্য লাভ করতো,
ইত্যাদি---।

আফসুস যে, সে সময় তাদেরকে এই কথাটা বলার কেউ ছিল না যে, ঐ
বিশ্বাসগুলি মিথ্যা, কোরআনের শিক্ষা বিরোধী। কেননা, সত্য তো এটাই যে,
ইস্রা (আঃ) মারা গেছেন। তিনি আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না।
মোর্দাকে জিন্দা করা তো একমাত্র খোদার কাজ, কোনও মানুষের কাজ নয়।
অথচ, খোদা-বিরোধী এই বিশ্বাসটাই যীশুকে খোদার আসনে বসিয়েছে। নবী
যে মৃতকে জিন্দা করেন, সে তো আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক
জীবন দান করা। নবী তো দৈহিক চিকিৎসার জন্য আসেন না, আসেন
আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে— অন্ধ ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক
চক্ষু দান করেন, আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে আধ্যাত্মিক আরোগ্য দান
করেন---ইত্যাদি।

আরও পরিতাপের বিষয় ছিল এই যে, যারা খৃষ্টান হয়ে যাওয়া তাদের বিরুদ্ধে অন্য সব আলেমরা কুফরীর ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন, মনে করতেন তাদের কর্তব্য সমাধা হয়ে গেছে। আরও বেশী মর্মান্তিক ব্যাপার এই ছিল যে, শুধু খৃষ্টান পাদ্বীদের কাছেই নয়, সনাতনী, আর্য সমাজী, ব্রাহ্মসমাজী প্রভৃতি হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহিতদের কাছেও মুসলিম আলেমরা পরাত্মক স্থীকার করেছিল। ফলে, অনেক মুসলিম সন্তান ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিল, এমনকি পরে শ্রী চৈতন্যের দলেও যোগদান করে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিল। এক কথায় সেদিনের রাজনৈতিকভাবে পরাজিত মুসলিম জাতিকে আধ্যাত্মিকভাবেও চারিদিক থেকে অঙ্ককার এসে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ঠিক এমনি ঘোরতর দুর্দিনে পাঞ্জাবের এক নিভৃত পল্লী থেকে সেদিনের এক অজানা অখ্যাত ব্যক্তি দণ্ডয়ামান হয়ে বজ্জ-নিনাদে ঘোষণা করলেন :

‘সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যৌবনে পদাপর্ণ করার পর

সে যেমন পুনরায় মাতৃগর্ভে ফিরে যায় না, তেমনি

প্রগতির ধ্বারায় দীন ইসলাম পূর্ণত্ব লাভের পর

পুনরায় খৃষ্টধর্মে ফিরে যাবে না। ইসলাম ধর্মই

জগতে (সব ধর্মের উপরে) বিজয়ী হবে। এটাই আল্লাহর বিধান।’.....

তিনি ঐশ্বী আদেশের অনুবত্তিতায় পৃথিবীর কোটি কোটি খৃষ্টান ও মুসলিমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাকী দ্যুর্থহীন কঢ়ে ঘোষণা করলেন :

‘ইসা ইবনে মরিয়ম মারা গেছেন। তিনি বেঁচে নেই, না যমীনে, না আসমানে। তিনি সমাধিস্থ আছেন শ্রী নগরের খান ইয়ার মহল্লায়। এবং তাঁর নামে যে ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি ছিল- সে আমিই।’

দুনিয়া-জোড়া খৃষ্টান রাজত্বের ভিত্তি নড়ে উঠলো। কারন, যীশুর খোদা-পুত্র এবং তাঁর রক্তে সকল মানুষের পাপের প্রায়শিত্ব তথা পরিত্রাণ লাভের সহজ ও লোভনীয় যে বিশ্বাসটা তাঁর প্রসারের মাধ্যমেই খৃষ্টান রাজত্বের ভিত্তিটা মজবুত হচ্ছিল সারাটা দুনিয়ায়। তাই, খৃষ্টান পাদ্বীরা তখন এত বেশী আশাবিত্ত হয়ে উঠেছিল যে, তারা ঘোষণা দিয়েছিল :

‘কাবাগৃহে ক্রুশ চিহ্নস্থাপনের দিন সমাগত প্রায়।’

কিন্তু পাদ্মীদের বড় সাধের, বড় সাধনার সেই আশায় বাধ সাধলেন তাদেরই ক্রুশীয় রাজত্বে বসবাসকারী এক ব্যক্তি। তিনি ঐশ্বী আলোকে আলোকিত হয়ে বিদ্রোহ করলেন পাদ্মীদের মিথ্যার বিরুদ্ধে এবং তাদের বিশ্বাসের ক্রুশকে তেঙ্গে খান করে দিলেন যুক্তি ও প্রমাণের শান্তিকৃপাণে, ঐশ্বী নির্দশনের মহিমার প্রতাপে। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ঐশ্বী আলোর ছটা বিছুরিত হতে থাকলো। সে আলোর ঝলকে আজ দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত অঙ্ককার অপসারিত হচ্ছে। এবং ইনিই সেই ঈসা ইবনে মরিয়ম যাঁকে হাদীসের বাণীতে বলা হয়েছে – ‘ঈসাবৃন্মা মারিয়ামা ইমামান মাহ্নীয়ান হাকামান আদলান।’

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ মানবেতিহাসে এক গৌরবের স্থান অধিকার করে আছে। এই সনে উত্তর ভারতের কাদিয়ান নাম এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করে এক শিশু। নবজাত শিশু কোন সাধারণ শিশু ছিল না। তকদীর ছিল এটাই যে, কালে সেই শিশুর দ্বারা এক মহাবিপ্লব সাধিত হবে আধ্যাত্মিক জগতে, বিপ্লব সাধিত হবে জড় জগতেও। পিতামাতা তার নাম রেখেছিলেন গোলাম আহমদ। পরবর্তীকালে তিনি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে। আল্লাহ তাঁকে মসীহ ও মাহদী রূপে নিয়োজিত করেন।

হাদীস শরীফে এসেছে : ‘ইউগ্যাতেউইস্মুহু ইস্মী’ : তার নাম হবে আমার নামের মত (তিরমিয়ী; আবু দাউদ)।

‘হজাজুল কেরামা’ নামক গ্রন্থে আছে মাহদীর নাম ‘আহমদ’ হবে। ‘মির্যা’ তাঁর বংশগত উপাধি, মির্যা শব্দের অর্থ- নেতা, লর্ড, সৈয়দ। ‘গোলাম’ শব্দটি তাঁর পিতা, ভাই ও কোন কোন পিতৃপুরুষের নামের সঙ্গে আছে। কাজেই তাঁর ব্যক্তিগত Identification বা পরিচিতিসূচক নাম হচ্ছে ‘আহমদ’। ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে বর্ণিত হলিয়া মোতাবেক- তাঁর দেহের গড়ন ছিল বনী ইসরাইলী; গায়ের রঙ গোধূম বর্ণ, মাথার কেশ সরল; ঘন দাঢ়ি; প্রশস্ত বক্ষ; উচু নাক; ডান গালে তিল; চক্ষু বড় ও সুর্মা মাখার ন্যায় কালো; প্রশস্ত ললাট; চেহারা জ্যোতির্ময় ইত্যাদি। তিনি ১৮৬৪/৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বপ্নযোগে প্রথম হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দীদার (সাক্ষাৎ) লাভ করেন। তিনি ১৮৬৮/৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম এলহাম বা ঐশী বাণী লাভ করেন।

১৮৮০ সালে তাঁর এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ আধ্যাত্মিক সম্পদের এক বিশাল খনি। এবং তা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে এইচ. এ. ওয়াল্টার লিখেছেন :

"The book was quite universally acclaimed ---- throughout the Muhammedan world as a work of power and originality "(The Ahmadiya Movement, p-16)

তদানীন্তন ভারতের অন্যতম বিখ্যাত আলেম (বিরুদ্ধবাদী) মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী লিখেছেন :

“আমার মতে এই কেতাব বর্তমান যামানার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক গ্রন্থ, যার সমতূল্য গ্রন্থ আজও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।” (ইশায়াতুস সুন্নাহ : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)।

ইসলামের খেদমতের জন্য অক্রান্ত সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন তিনি।

মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবের কথায় :

“(বারাইনে আহ্মদীয়া গঞ্জের) প্রণেতা ইসলামের খেদমতে ব্যক্তিগত ও আর্থিক কোরবানী এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দিক দিয়ে, রচনায় ও বক্তৃতায় এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে তাঁর তুলনা বিরল।” – (প্রাণকৃত)

তাঁর ইসলামী খেদমতের নিরলস কর্মকাণ্ডে একদিকে এতদিনের হতাশায় মুহ্যমান মুমিনেরা যেমন নবীন আশায় বুক বেঁধে দাঁড়াল; অন্যদিকে তেমনি মিথ্যাচরী শয়তানেরও সকল শক্তি রূপে দাঁড়াল।

একদিকে যেমন মুমিনের প্রাণের আবেদন ক্ষূরিত হলো ;

‘হাম মরিয়ু কি তুমহী পে হ্যায় নয়ৱ; তোম মসীহা বলো খোদাকে লীয়ো।’

অন্যদিকে তেমনি বিরুদ্ধ শক্তি চীৎকার করে উঠলো ;

‘এর চাইতে বড় ঈশ্বরনিন্দা (Blasphemy) আৱ কী হতে পাৱে?’

বিরুদ্ধবাদীরা বললো :

“ The doctrine of Trinity, Ahmad attacked with virulent animosity.”

(H. A. Walter : The Ahmadiya Movement : p—94)

‘ত্রিতুবাদী ধর্মতত্ত্বে আহমদ আক্রমণ করেছিল ভয়ঙ্কর শক্তিসহ’—
কেননা, তাদের কথায়— যেমন, জে এন ফার্কুহার লিখেছেন :

“He (Hazrat Mirzā Ghulam Ahmad) First sets about proving that Christ did not die on the Cross, rise from dead, and ascend to Heaven”

(J. N. Farquhar : Modern Religious Movements in India : p-137)

“তিনিই (হ্যরত গোলাম আহমদ) প্রথম প্রমাণ করতে চাইলেন যে, যীশু
খৃষ্ট ত্রুশে মারা যাননি, মরার পর জীবিত হননি এবং স্বর্গেও উন্মোত্ত হননি।”

“---he asserts that Christianity is spiritually dead”

(Ibid : p—147)

“তাঁর দাবী এটাই যে, খৃষ্টধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে মৃত।” (প্রাণকু পৃঃ ১৪৭)

নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য যে, যীশু খৃষ্টের স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণিত হলে
প্রচলিত খৃষ্ট ধর্মের আধ্যাত্মিক মৃত্যু প্রমাণিত হয় এবং ইহুদী জাতির ঈসাকে
(আঃ) মারার দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। এবং এই সত্যটি (ঈসার—আঃ—
স্বাভাবিক মৃত্যু) যিনি অকাট্য যুক্তি ও দলিল প্রমাণে সাব্যস্ত করেছেন তিনিই
হ্যরত মিয়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তাই তো ভারতের বিখ্যাত
আলেম মওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের তফসীরুল কোরআনের
ভূমিকায় লিখিত হয়েছে : ‘মৌলবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তখন রুখে
দাঁড়ালেন এবং বিশপ লেফ্রাই ও তার সঙ্গীদেরকে সর্বোধন করে বললেন,
‘তোমরা যে ঈসার (আঃ) কথা বলছ, তিনিতো অন্যান্য মানুষের মতই মারা
গেছেন, এবং যে ঈসার (আঃ) আগমনের সংবাদ দেওয়া আছে, সে ব্যক্তি
আমিই। সুতরাং তোমরা যদি পুণ্যবান হও, তাহলে আমাকে গ্রহণ কর। এই
পক্ষে অবলম্বন করে তিনি লেফ্রাইকে এমনভাবে নাজেহাল করলেন যে, তার
আর পালাবার পথ রইল না। এই একই উপায়ে তিনি হিন্দুস্থান থেকে শুরু
করে সুদূর ইংল্যান্ডের পাদ্রীদেরকে পর্যন্ত পরাম্পরাগত করলেন।”

হয়রত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ‘মামুর’ বা প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক হবার ‘ইলহাম’ লাভ করেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। তিনি যামানার মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হওয়ার দাবী ঘোষণা করেন ১৮৮৪ সালে।

প্রথম বয়াত বা দীক্ষা দান শুরু করেন ১৮৮৯ সালে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে।

১৮৯১ সালে প্রথমে প্রতিশ্রূত ঈসা মসীহ বা ‘মসীহ মাওউদ’ (আঃ) এবং ‘ইমাম মাহ্মুদ’ হওয়ার দাবী করেন। এইসব দাবীর পর বিরুদ্ধবাদিতার তুফান তুঙ্গে উঠতে থাকে, এবং কুফরী-ফতোয়ার বাড় উঠতে থাকে চতুর্দিকে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি আর্যসামাজী সকলেই একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ঝঁঝঁৰার বেগে ঝাপিয়ে পড়লো। এই দুঃসহ পরিস্থিতিটাও সাক্ষ্যদান করলো তাঁর সত্যতার স্বপক্ষে। কেননা, হয়রত মুহী উদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) লিখেছেন : “যখন ইমাম মাহ্মুদ আবির্ভূত হবেন তখন আলেমরাই তাঁর প্রকাশ্য শক্র হবে। তারা মনে করবে যে, তাঁকে মানলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে না এবং জনসাধারণ ও তাদের মধ্যেকার পার্থক্য উঠে যাবে।” (ফতুহাতে মক্কীয়া, পৃঃ ৩৭৩)।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হয়রত আহমদ সরহিন্দী (রহঃ) লিখেছেন :

“মাহ্মুদী (আঃ) এর বর্ণিত আধ্যাত্মিক সৃষ্টি তত্ত্বাবলী বুবতে না পেরে জাহেরী আলেমরা ঐগুলিকে কিতাব ও সুরতের বিরুদ্ধ মনে করবে এবং অস্বীকার করবে। – (মকতুবাত, ২য় খন্দ, পৃঃ ৫৫)।

সুতরাং, ইমাম মাহ্মুদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পীর-পণ্ডিত, যাজক-পুরোহিত, উলেমা-মাশায়াখদের পক্ষ থেকে হিংসা-দুষ্মনীর যে এক প্রবল ঝঁঝঁৰা বইতে থাকবে, সে তো জানা কথাই। এবং এও জানা কথা যে, ঐ সব ঝাড়-ঝঁঝঁৰা দেখতে দেখতে ধূম্রুগুলীর ন্যায় বিলীন হয়ে যাবে এবং গেছে বা যাচ্ছেও খোদার ফজলে। ঐ সব বিরুদ্ধ ঝড়ের দু’একটা ঝাপটার বিবরণ দিতে চাই আমরা :

অমৃতসরের মৌলবী সানাউল্লাহ নামক এক ব্যক্তি অহেতুক বাড়াবাড়ি
শুরু করে দেয়। এবং রাঙ্গতেই থাকে। তখন, হযরত মির্যা সাহেব (আলাইহেস্স
সালাম) তার বিরুদ্ধে এক মুবাহালার চ্যালেঞ্জ করতে বাধ্য হন এবং বলেন :
“মিথ্যাবাদী সত্যবাদীর জীবন্দশায় ধ্বংস হউক”

(দ্বঃ-আঞ্জামে আধম : প্রকাশ - ১৮৯৭)

এই ধরনের মুবাহালার (প্রার্থনা যুদ্ধ) প্রধান শর্ত হচ্ছে উভয় পক্ষের সম্মতি
ও স্বীকৃতি থাকতে হবে। কিন্তু, এক্ষেত্রে মৌলবী সানাউল্লাহ এই চ্যালেঞ্জ
সরাসরি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন এবং তিনি অস্বীকৃতি ও অসম্মতি
জ্ঞাপন করেন। বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি টালবাহানা করে কালক্ষেপ করতে
থাকেন।

অবশেষে, হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ১৫ই এপ্রিল, ১৯০৩ তারিখে মৌঃ
সানাউল্লাহকে একটি পত্র লিখেন। পত্রটির শিরোনাম ছিল : ‘শেষ ফায়সালা’।

তখন জনাব অমৃতসরী লিখলেন :

“হে মির্যায়ীগণ! তোমরা----- তাকে আমার সম্মুখে হাজির কর, যে
মুবাহালা করার আহ্বান করেছে।” সানাউল্লাহ সাহেবের এই কথাতে পরোক্ষে
হলেও মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়ে যায়। তাই, হযরত মির্যা সাহেব
(আঃ) তাঁর ‘এযায়ে আহমদী’ পুস্তকে লিখলেন :

“এখন এর উপরে তিনি কার্যম থাকলেই হয়।”

তখন, মৌলবী অমৃতসরী ভীত হয়ে লিখলেন :

“আমি আপনাকে মুবাহালার জন্য ডাকিনি। ----- আমি কসম খাইতে
বলেছি। কসম এক জিনিস, মুবাহালা অন্য জিনিস।”- (দ্বঃ- ‘আহলে হাদীস’
পত্রিকা- এপ্রিল ১৯, ১৯০৭)।

অতঃপর, মৌঃ সানাউল্লাহ অমৃতসরী অনেক কথাই লিখলেন। তন্মধ্যে,
মাত্র তিনটি কথাই সত্যার্থীর জন্য যথেষ্ট হবে :-

(১) “খোদার রসূল যেহেতু পরম দয়াময় ও স্নেহশীল হন, সেজন্য সর্বদা
তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাই থাকে যাতে কোন ব্যক্তি ধ্বংস না হয়; কিন্তু এখন
আপনি কেন আমার ধ্বংসের জন্য দোয়া করছেন?”

(২) “নবী করীম (সা:) সত্য নবী হওয়া সত্ত্বেও চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামার পূর্বে ইন্দ্রিয়কাল করেছেন, এবং মুসায়লামা মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও সত্যবাদীর পরে মারা গেছে।”

(মুরাক্কা কাদিয়ানী, পৃঃ ১১)

(৩) “খোদাতায়ালা মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ, ফাসাদকারী ও অমান্যকারী লোকদেরকে দীর্ঘায়ু দান করেন” – ইত্যাদি।

– (আহুলে হাদীস পত্রিকা – এপ্রিল ২৬, ১৯০৭)

(দ্বঃ – এই লেখকের – ‘খাতামুমবীউন (সা:) : মোকাম ও মহিমা’।)

আলেকজাণোর ডোই

আলেকজাণোর ডোই অষ্টেলিয়ার লোক। সে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। সে প্রচার করে যে, সে যীশুর অগ্রদূত ‘এলিজা’ এবং অটীরেই যীশুখৃষ্ট অবতীর্ণ হবেন। সে সময় লক্ষণাদি দেখে অনেক ধর্মোৎসাহী লোক বিশ্বাস করতো যে, মসীহার পুনরাগমন আসছে। ‘ডোই’ এর ঘোষণার পর বহু লোক তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। তার শিষ্যসংখ্যা লাখের কোঠায় পৌছে যায়। সে প্রচুর বিজ্ঞানী হয়ে উঠে এবং একটি শহর গড়ে তোলে, যার নাম দেয় সে ‘জায়ন সিটি’ – Zion City.

১৯০২ সালে সে ঘোষণা করলো যে, দুনিয়ার মুসলমানরা যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে তারা ধৰ্মসহ হয়ে যাবে। তার এই ঘোষণার জবাবে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) এক ইশতেহার প্রকাশ করলেন, যাতে তিনি ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরলেন, এবং নিজেকে প্রতিশ্রূত মসীহ বলে দাবী করে ডোইকে ‘প্রার্থনা যুদ্ধ’ বা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই ইশতেহার বিপুলভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। ডোই এই ইশতেহারের জবাব দিল না। পক্ষান্তরে ১৪-২-১৯০৩ তারিখে সে তার কাগজে লিখলো : "Pray to God that Islam will soon

disappear from the world. O God! accept this prayer of mine, O God! destroy Islam."

কিছুদিন পরে পুনরায় সে তার কাগজে অনুরূপ কথা লিখে প্রকাশ করলো।

মসীহ মওউদ হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) লক্ষ্য করলেন যে, ডোস্ট তার শক্রতা পরিত্যাগ করছে না। তখন তিনি ১৯০৩ সালে আর একটা ইশতেহার প্রকাশ করলেন। এই ইশতেহার 'ডোস্ট ও পিগট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী' নামে খ্যাত। পিগট ছিল ইংলণ্ডের একজন ভঙ্গ দাবীকারক।

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) লিখলেন যে, তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে আল্লাহ তাঁর তৌহিদ বা একত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শিরক বা অংশীবাদিতা উৎখাত করার জন্য। তাঁর দ্বারা আমেরিকাবাসীর জন্য এক নির্দশন প্রকাশিত হবে। এবং এই নির্দশন হলো— আলেজাঞ্জার ডোস্ট তাঁর (আঃ) মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে এবং তাঁর জীবন্দশায় নিরাকৃষ্ণ দুঃখ-যন্ত্রণা ও লাঙ্ঘনার মধ্যে মারা যাবে। তিনি আরও লিখলেন যে, জায়ন সিটিতে দুর্যোগ নিপত্তি হবে। এই ইশতেহারও ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পন্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। এই ইশতেহার প্রকাশের সময়কালে ডোস্ট এর শিষ্য-সাগরেদ, ধন-সম্পত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি উন্নতোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রথমে অগ্রাহ্য করলেও পরে সে লোকের চাপের মুখে লিখলো :

There is a Mohammadan Messiah in India who has repeatedly written to me that Jesus Christ lies buried in Kashmir, and people ask me why I do not answer him. Do you imagine that I shall reply to such gnats and flies? If I were to put down my foot on them I would crush out their lives. I give them a chance to fly away and live."

ফলে, এতদিন ধরে সে যে দূরে থাকার চেষ্টা করছিল, এবাবে ক্রোধে নির্বোধের মত মুবাহালায়, পরোক্ষে হলেও, আটকা পড়লো। এই ধারায় সে তার ক্রোধ ও দষ্ট প্রকাশ করতেই থাকে এবং অবশেষে ১৯০৩ সালের

ডিসেম্বরে সে খোলাখুলিতাবেই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং সে হ্যারত মির্যা সাহেবের মৃত্যুর ভবিষ্যত্বাণী করে বসে।

সে মসীহ মওউদ (আঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করলো- ‘নির্বোধ মুহাম্মদী মসীহ’ ---foolish Mohammadan Messiah". সে দাবী করে বললো, 'আমি যদি এই জগতের বুকে খোদার প্রেরিত পুরুষ না হই, তবে আর কেউ নয়।'--- মুবাহালার পরিণতিতে বিধির বিধানে যা হবার তাই হলো। আলেকজান্ডার ডোই ও তার সাথের গড়া জায়ন সিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই তার নামে তহবিল তসরুফের নালিশ দায়ের হল এবং লক্ষ লক্ষ ডলার তসরুফের দোষে দোষী সাব্যস্ত হল। প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ডোই একজন ভভ, প্রতারক ছিল। তার শিষ্য সাগরেদোরা তাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করল। প্রকাশ পেয়েছিল, ডোই পরস্বাপহরণকারী ছিল, মদ খোর ও ব্যভিচারী ছিল। তার স্ত্রী—পুত্র পর্যন্ত তাকে পরিত্যাগ করলো। সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ধীর ধীরে অবশ হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে, নিদারণ অপমান ও দুঃখ—লাঙ্ঘনার মধ্য দিয়ে তার জীবন লীলা সাঙ্গ হয়।

এ সম্পর্কে পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়। যেমন, "Ahmad and his adherents may be pardoned for taking some credit for the accuracy with which the prophecy was fulfilled a few months ago." (Dunville Gazette, June 7, 1904)

" Dowie died with his friends fallen away from him and his fortune dwindled. He suffered from paralysis and insanity . He died a miserable death, with Zion City torn and frayed by internal dissensions, Mirza comes forward frankly and state that he has won his challenge." (Boston Herald, June 23, 1904)

এক্ষেপ মন্তব্যাদি সহ আমেরিকার আরও অনেক পত্রিকা 'ডোই' এর ধ্বংস ও আহমদের (আঃ) বিজয়ের উল্লেখ করেছিল।

হয়রত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সহিত মোকাবেলায় ইসলাম ও হয়রত
রসুলে পাক (সাঃ)-এর বহু প্রকাশ্য দুষমন মসীহ মওউদ (আঃ)-এর
ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধৰ্মসপ্রাঙ্গ হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির
নাম হচ্ছে:

- (১) পাদ্মী আবদুল্লাহ আথম,
- (২) আর্যসমাজের নেতা পশ্চিত লেখরাম পেশোয়ারী।

রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ

হয়রত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক তাঁর দাবীসমূহ পেশ করার পর
সমসাময়িক বিরুদ্ধবাদী বহু আলেম এই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, ইমাম
মাহদীর আবির্ভাবের বড় নির্দশন হচ্ছে একই রজমান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও
সূর্যগ্রহণ হওয়া। কিন্তু ঐ সব ঘটনা যেহেতু সংঘটিত হয়নি, সেহেতু তাঁর দাবী
সত্য নয়।’ জবাবে হয়রত মির্যা সাহেব বললেন যে, দাবীকারকের দাবীর পূর্বেই
গ্রহণের ঘটনাগুলি ঘটে গেলে যে কোন অসৎ ব্যক্তি প্রতারণা করে বলতে
পারবে, ‘ঐ যে দেখ, চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ ঘটে গেল এবং আমিই প্রতিশ্রূত
ইমাম মাহদী।’ সুতরাং পরিস্থিতি এই রূপ হওয়া আবশ্যক যে, দাবীকারক
তাঁর দাবী আগে প্রকাশ করবে এবং পরে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্যবরূপ ঐ সব
আস্মানী ঘটনা সংঘটিত হবে, যেগুলির উপরে মানুষের কোন হাত নেই। দাবী
কারক যদি আল্লাহর তরফ থেকে দণ্ডয়মান হয়, তবে অবশ্যই তাঁর স্বপক্ষে
আল্লাহ কর্তৃক ঐ সকল আস্মানী নির্দশন প্রদর্শিত হবে, অন্যথায় সে
মিথ্যাবাদী ও ভঙ্গপ্রমাণিত হবে।’

হয়রত মির্যা সাহেব আল্লাহতায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তাঁর প্রতিশ্রূত
মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী প্রকাশ করেন ১৮৮৯-’৯১ সালের মধ্যে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কখনই তাঁর প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেন না। তিনি তাঁর
মনোনীত বাস্তাগণের সঙ্গে সর্বদা প্রেম ও বিশ্বস্তার সহিত ব্যবহার করে
থাকেন। তাঁর প্রতিশ্রূতি এবং হয়রত রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী
অনুযায়ী উক্ত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় ১৮৯৪ সালের নিদিষ্ট মাসে নিদিষ্ট

তারিখদ্বয়ে এবং এইভাবে সমগ্র জগতের নিকট প্রকাশিত হয় যে, হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাৎ)-এর খোদা সর্বশক্তিমান ও সর্বোচ্চ। তিনি এই নির্দশন একবার নয় বরং দুইবার প্রদর্শন করেন। পরবর্তী বৎসর এই নির্দশন পক্ষিম গোলার্ধে আবারও প্রদর্শিত হয়। দুই দুই বারই, দুইটি গ্রহণ একই মাসের একই তারিখগুলিতে সংঘটিত হয়, যেন প্রাচ্য ও প্রাচীচ্যের পুরাতন ও নৃতন জগতের সকল মানুষ খোদাতায়ালার সর্বোচ্চ মহিমা ও শক্তির বিকাশ অবলোকন করে, যেন তারা হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাৎ)- এবং তাঁর আধ্যাত্মিক পুত্র মির্যা গোলাম আহমদ (আৎ)- এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। মহান, মহান সেই নবী (সাৎ)- যিনি ঐ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এশীজনের ভিত্তিতে এবং মহান তাঁর সেই আধ্যাত্মিক পুত্র যাঁর সত্যতার জন্য তা পূর্ণ হয়।

হ্যরত রসূলে পাক (সাৎ)-এর যামানা থেকে হ্যরত মসীহ মাউন্ড (আৎ)-এর যামানা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে এবং পরেও কিছুসংখ্যক ব্যক্তি মাহুদী হওয়ার দাবী করেছিল। কিন্তু হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আৎ) ব্যতীত অন্য আর কারো স্বপক্ষে চন্দ্র ও সূর্য সাক্ষ্য দান করেনি। তাহলে কি প্রমাণিত হয় না যে, হ্যরত রসূলে পাক (সাৎ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাই সত্যাবেষীর জন্যে যথেষ্ট? যথেষ্ট যামানার ইমামকে চেনার ও মানার জন্য?

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ইমাম কে?

হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে ১৩০৬ হিজরী সালে প্রতিশ্রূত মসীহ ও মাহুদী হওয়ার দাবী পেশ করেন হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আৎ)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা এই যামানার ইমাম তিনিই। অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে হজরত রসূলে পাক (সাৎ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। যে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দ্বারা প্রতি শতাব্দীতেই আল্লাহ রবুল আলামীন তাঁর প্রিয়তম রসূল (সাৎ)-এর সত্যতাকে তুলে ধরেছেন দুনিয়াবাসীর সামনে ধারাবাহিকভাবে। এই এশী ধারাবাহিকতায় বা রহানী সিলসিলায় কখনই ছেদ

পড়েনি। এই ঐশ্বী সিলসিলায় আগমনকারী মুজাদ্দিদগণের পবিত্র নামের যে তালিকা দেওয়া আছে হয়রত নবাব সিন্দীক হাসান থাঁ প্রণীত ‘হজাজুল কেরামা’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে, তা হচ্ছে :

হয়রত ওমর বিন আবদুল আয়ীয় (রহঃ)	২য় হিজরী শতাব্দী
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও	৩য় „ „
ইমাম আহমদ বিন হাসল (রহঃ)	৪৬ „ „
আবু শরাহ (রহঃ) ও আবুল হাসান আশ আরী	৫ম „ „
আবু ওবায়দুল্লাহ নিশাপুরী (রহঃ) ও	৬ষ্ঠ „ „
কাঞ্জী আবুবকর বাকলানী (রহঃ)	৭ম „ „
হয়রত ইমাম গায়্যালী (রহঃ) ও	৮ম „ „
সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)	৯ম „ „
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এবং	১০ম „ „
খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমীরী (রহঃ)	১১শ „ „
হাফিজ ইবনে হায়র আসকালানী (রহঃ) ও	১২শ „ „
হয়রত সালেহ বিন ওমর (রহঃ)	১৩শ „ „
ইমাম সিউতি (রহঃ)	হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী শেষ হয়ে এখন তো পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে,— যাঁরা হয়রত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে মানেননি বা মানতে চান না, তাঁরা কাকে এই ‘যামানার ইমাম’ মেনেছেন? হিজরী চৌদ্দ শতকের এই ইমামকে যারা মানেননি, তাঁরা কি প্রকারান্তরে এই কথাই বলছেন না যে, আহয়রত (সাঃ)-এর যে মহান ভবিষ্যত্বাণী বিগত তের শ’ বছর যাবৎ পূর্ণ হয়ে এসেছে, চৌদ্দ শ’ বছরে এসে তা পূর্ণ হয়নি? তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, খোদাতয়ালা তাঁর যে প্রিয় রসুলের সমর্থনে এবং সত্যতায় তের শ’ বছর ধরে লোক খাড়া করলেন এবং তাঁর শরীয়তের

সংস্কার ও প্রসারের কাজে তত্ত্বাবধান করলেন, সহায়তা দান করে এলেন, তা সহসাই চৌদ্দ শতকে এসে কী করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে? তাঁদের কি অধিকার আছে যে, তাঁরা আঁহয়রত (সাৎ)-এর সত্যতার বিপক্ষে মত খাড়া করেন? মনে রাখা দরকার যে, চন্দ্র সূর্যের আলোদান বন্ধ হতে পারে, কিন্তু মুহাম্মদী ফয়জানের আলোদান বন্ধ হতে পারে না। হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিন, হৃদয় মুহাম্মদী নূরে আলোকিত হবে, ইনশাআল্লাহু।

আজ দৃশ্যতৎ: সাধারণভাবে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহুর মাথার উপরে কোন ইমাম নেই। কিন্তু নেই কেন?

আজও হাজারো কল্পিত কাহিনীতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মুসলিম উম্মাহুর মন ও মন্তিক। বলা হয়,-ইমাম মাহ্মুদী এসে চলিশ হাত লয়া এক তলওয়ার দিয়ে লড়াই করবেন। লড়াই করে সকল শক্তিকে পরাত্ত করে ইসলামের বিজয় সম্পন্ন করবেন। কিন্তু, আধুনিক রাসায়নিক অস্ত্র এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তরবারির যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করবেন,- একথা তো কোন পাগলেও বিশ্বাস করবে না। আর যদি বা অস্ত্র যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়ও, তবে সে তো হবে অস্ত্র শক্তির জয়, সে তো ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের জয় হবে না। তাহলে, যুদ্ধবাজ এক মাহ্মুদীর প্রতীক্ষায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা কি অস্ত্রশক্তির জয় চান, না কি ইসলামের পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির জয় চান? হাদীস শরীফে তো বলা আছে, ইমাম মাহ্মুদী ‘যুদ্ধ রহিত’ করবেন, অর্থাৎ তিনি ধর্মের নামে প্রচিলত জেহাদ বা অস্ত্রযুদ্ধ নিষিদ্ধ করবেন। পরিবর্তে তিনি জেহাদে আকবর বা বৃহত্তর জেহাদ জারি করবেন, অর্থাৎ আজ্ঞা শুন্দি। প্রমাণ ও কলমের যুদ্ধ করবেন। আল্লাহু ও রসূলের দুষ্মনদেরকে ঐশী নির্দশন প্রকাশের মাধ্যমে পরাভূত করবেন। নিজের এবং নিজের অনুসারীদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার আদর্শ এবং রসূলে পাক (সাৎ)-এর সুন্নাহ অনুসরণের উৎকৃষ্ট নমুনা দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরবেন। এবং সেই বৃহত্তর জেহাদের ময়দানে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তীর্ণ করবেন। আল্লাহু তায়ালার অশেষ রহমে ও ফজলে এই জেহাদে আকবরই জারি করে গেছেন যুগ-ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্মুদী মির্যা গোলাম আহুমদ (আৎ)।

যাঁরা যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের বিজয় কামনা করেন, তাঁদেরকে একবার তেবে দেখতে হবে যে, বর্তমান যামানায় ইসলামী যুদ্ধ (অস্ত্রের) আদৌ সম্ভব কি না? কেননা, ইসলামী যুদ্ধের নীতিমালা অনুযায়ী যুদ্ধকালে— শিশু, নারী এবং বয়োবৃন্দ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা অবৈধ, বসতবাড়ী, শস্যক্ষেত, খামার ও ফলবান বৃক্ষ ধ্বন্স করা নিষিদ্ধ— ইত্যাদি। এই যুদ্ধ-নীতি কি আধুনিক যুদ্ধে মেনে চলা সম্ভব হবে? হবে না। যদি না হয়, তবে তো আধুনিক অস্ত্রের এই যুগে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী যুদ্ধ এমনিতেই ‘নিষিদ্ধ’ বা ‘রহিত’ হয়ে গেছে। কথাটা শুধু প্রকাশ্যে বলে দেওয়ার বাকী ছিল। এবং এই যামানায় ‘যুদ্ধ রহিত’ হওয়ার সেই ঘোষণাটাই প্রকাশ্যে দেওয়ার দায়িত্ব নির্ধারিত ছিল ইমাম মাহদীর জন্য, এবং সেই দায়িত্ব তিনি পালনও করেছেন।

এছাড়া, আরও একটা বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে। এবং তা হচ্ছে, এই যুগে কেউ ইসলামকে ধ্বন্স বা উৎখাত করার জন্য তরবারি বা অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করে না, আক্রমণ করে কলম দ্বারা। কাজেই কলম দ্বারাই লড়াই করতে হবে ইসলামের শক্তিদের বিরুদ্ধে এবং এই কলমের যুদ্ধে যিনি সকল দুর্মুখ ও মিথ্যাচারী শক্তিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, কলম-যুদ্ধের সকল ময়দানে, তিনিই তো ইমাম মাহদী (আঃ)! তিনি যে তাঁর অসংখ্য অমূল্য রচনাবলী, আধ্যাত্মিক সম্পদে ভরপূর রচনাবলী রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে হ্যরত রসূলে আকরাম (সাঃ)—এর যে সীমাহীন মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে গেছেন এবং ইসলামের যে অঙ্গ উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্যরাজি প্রকাশিত করে গেছেন,— কেয়ামত পর্যন্ত তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারো হবে না। এবং এজন্যই আল্লাহ পাক তাঁর কলমকে আখ্যায়িত করেছেন ‘আলীর জুলফিকার’ বলে,— তাঁকে উপাধি দিয়েছেন ‘সুলতানুল কলম’— ‘লেখনী সম্পাট’।

মুসলমান জাতিকে তো খাড়া করা হয়েছিল উৎকৃষ্ট জাতি হিসেবে— ‘খায়রা উশ্মাহ’ হিসেবে। খাড়া করা হয়েছিল অন্য সকল জাতিকে শিক্ষাদান করার জন্যে, খোদার পথে পরিচালিত করার জন্যে। কিন্তু, আজ? আজ মুসলিম উশ্মাহর কি অবস্থা? তারা আজ কাছে মার না আছে? তারা কি আজ

প্রকাশ্য দৃশ্মন ইহুদী-নাসারাদের করুণার ভিত্তির নয়? তারা কি আজ আবরাহার খৃষ্টান শক্তির মুখাপেক্ষী নয়? তাদের চাইতে কি আব্দুল মুত্তালিবের ইমানও উন্নত ছিল না? আব্দুল মুত্তালিব তো সেদিন পবিত্র কাবার গিলাফের আঁচল ধরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে বলেছিলেন :

‘প্রভু আমার! মানুষ যেমন লুঠনকারীর হাত থেকে
তার ঘর ও সম্পত্তি রক্ষা করে, তেমনি তোমার
এ ঘরকে তুমি বাঁচাও। প্রভুহে! কাবার উপরে
তুমি ক্রুশের বিজয় দিও না।’

আর আজ? আজ তো সেই ক্রুশীয় শক্তির পতাকাবাহীরাই খোদার ঘরের যমীনের উপরে বিজয়ীর দণ্ডে বিচরণ করছে। এমনকি ইহুদীরাও। হায়। মুসলিম উশ্মাহ, এখনও যদি তোমার হৈশ না হয়, তবে আর কবে হবে?

অথচ, এই অবস্থায় হুকুম ছিল উশ্মতের উপরে আহ্যরত (সাঃ) এর-

فَإِذَا رَأَيْتُمْ كَوَافِرَهُ فَلَا يَحِبُّوْا عَلَى الشَّجَرِ قِائِمَصَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ

(سناب ماجة بباب خروج المهدى)

“তার আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার হাতে
বয়াত করবে যদি বরফের উপরে হামাগুড়ি দিয়েও
যেতে হয়; কেননা, নিচয় সে আল্লাহর খলীফা আল মাহ্মদী।”

—(সুনানে ইবনে মাজা : বাবে খুরুজুল মাহ্মদী)

এই যে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রসুলে পাক (সাঃ) এবং অন্যান্য বর্ণনায় যে আছে ইমাম মাহ্মদী জাহির হবেন মক্কা-মদীনার বা দামেস্কের পূর্বদিকে তা থেকে বোৰা যায় যে, আরবের পূর্বদিকে অবস্থিত কোন পর্বত অতিক্রম করেই পৌছতে হবে ইমাম মাহ্মদীর কাছে। এই সব বর্ণনায় এই ইংগিতই রয়েছে যে, হিমালয় পর্বতের এই পারে জন্মগ্রহণ করবেন ইমাম মাহ্মদী। মরম্মতির দেশ থেকে বরফের উপর দিয়ে যাওয়ার কথা বলাটা নিচয়ই তৎপর্যপূর্ণ। অন্য এক হাদীসে

আছে,— মাহ্নী নদীনালা বিধৌত অঞ্চল থেকে আবির্ভূত হবেন। আমাদের জানা মতে, পৃথিবীতে মাত্র একটি অঞ্চলই রয়েছে যার নামের মধ্যেই ধরা আছে যে, এলাকাটি নদ—নদী বিধৌত এবং এই নামটি হচ্ছে পাঞ্জাব (পাঞ্জ+আব = শতদ্রু, বিপাসা, ইরাবতী, খিলাম ও চেনাব) এবং এই পাঞ্জাবের অন্তর্বর্তী কাদিয়ান (এক হাদীসে উল্লেখিত ‘কাদা’ শব্দের অপভ্রংশ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন ইমাম মাহ্নী (আঃ)।

অন্য এক হাদীসে আছে :

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ মাহ্নীকে পাবে, তার উপরে ঈমান আনবে, তাকে আমার ছালাম পৌছাবে।” (কানযুল উম্মাল)

এই ছালাম পৌছান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আঁহ্যরত (সাঃ) স্বীয় উম্মতের মধ্যে মাত্র বিশেষ দু'জন উম্মতিকে তাঁর ছালাম পৌছাতে আদেশ করেছিলেন, একজন ছিলেন তাঁর সমসাময়িক হ্যরত খাজা উয়ায়েস করণী (রহঃ) অপরজন শেষ যামানার হ্যরত ইমাম মাহ্নী (আঃ)।

আঁহ্যরত (সাঃ) আরও বলেছেন :

‘ওয়াজিব প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার সাহায্য করা (কিংবা বলেছেন) তার ডাকে সাড়া দেওয়া।’— (সুনানে আবু দাউদ : কিতাবুল মাহ্নী)।

সুতরাং আমাদের মুসলিম উম্মাহর পক্ষে একথা আজ তেবে দেখবার সময় এসেছে যে, আমরা হ্যরত রসুলে পাক (সাঃ)—এর ঐ সব আদেশ ও নির্দেশ মান্য করছি, না কি উপেক্ষা ও অবহেলা করে চলেছি?

ওহী—ইলহাম বা গ্রিশীবাণী

ইসলামের ইতিহাসে—

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অতীতের প্রত্যেক মুজাদ্দিদ— যাঁরা যামানার ইমাম ছিলেন, তাঁরা ছিলেন,— আল্লাহু কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট’— ‘মামুর মিনাল্লাহ’। কেননা, আল্লাহু কর্তৃক আদিষ্ট না হয়ে কেউ নিজেকে মুজাদ্দিদ বা ‘যুগ—ইমাম’ বলে দাবী করতে পারেন না। যদি কেউ কখনও খোদার নামে মিথ্যা দাবী করে, তবে খোদা স্বয়ং সেই ভল্ল মিথ্যাবাদীকে ডান হাতে ধরে জীবন—শিরা কেটে

দেন। সে ধৰণস্থান হয়। তার অনুসারী থাকলে তারাও অটিরে শেষ হয়ে যায়। হয়রত রসূলে পাক (সা:)—এর সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহ্ বলেছেন :

“এবং সে (হয়রত মুহাম্মদ -সা:) যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তা হলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম ; তারপর আমরা তার জীবন শিরা কেটে দিতাম; তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউই তা (আমার শাস্তি) ঠেকায়ে রাখতে পারতো না তার (উপর) থেকে।” (৬৯ : ৪৫-৪৮)

হয়রত মির্যা সাহেব (আ:) যখন দাবী করলেন যে, তাঁকে আল্লাহ্ ওহী মারফৎ জানিয়েছেন যে, তিনি হিজরী চৌদ্দ শতকের মুজাদ্দিদ, এই যামানার ইমাম এবং আল্লাহ্ তাঁকে মাহদী ও মসীহ হিসেবে মনোনীত করেছেন, তখন বিরুদ্ধবাদী আলেমরা এই প্রশ্ন তুললো যে, ওহী-ইলহাম বা প্রশীবাণী এবং ঝুলু কুদুস ফিরিশ্তার অবতরণ যেহেতু আঁহ্যরত (সা:)-এর পরে চিরতরে বৰু হয়ে গেছে, সেহেতু মির্যা সাহেব ওহী-ইলহাম পাওয়ার যে দাবী করছেন তা মিথ্যা। অথচ, বাস্তব সত্য এটাই যে, ওই আলেমদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ‘জোরদার ছিল’ যে, পূর্ববর্তী যামানার ওলী-আল্লাহগণ ওহী-ইলহাম লাভ করতেন এবং পূর্ববর্তী প্রত্যেক যামানার ইমামই ছিলেন ‘মামুর মিনাল্লাহ’-আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট। কেবল, হয়রত মির্যা সাহেবের ক্ষেত্রেই তাঁরা এই ভ্রান্ত কথাটা প্রচার করতে থাকলেন যে, যামানার ইমাম আল্লাহ্ মনোনীত করেন না, বরং তাঁকে নির্বাচিত করে জনগণ। এবং এই ভ্রান্ত মতটা ইদানীঁ বেশ প্রসার লাভ করছে রাজনৈতিক ইচ্ছালিঙ্গার কারণে। কিন্তু, তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেন না যে, নবুওয়াত ও রেসালত যেমন ঐশী বিষয়, লৌকিক নয়, তেমনি যামানার ইমামও ঐশী বিষয়, লৌকিক নয়। কাজেই, লোকের দ্বারা ‘যুগ-ইমাম’ নির্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। খোদা আছেন। খোদার অঙ্গিত্তের মতই খোদার গুণাবলী চিরস্থায়ী ও চিরঝীব এবং অপরিবর্তনীয়। খোদা তার বান্দার সাথে কথা বলেন, বান্দার প্রার্থনা শোনেন, প্রার্থনার জবাব দিয়ে থাকেন। এই চিরস্তন সত্যের প্রতি বিশ্বাস হারানোর পরিণতি তো এই হয়েছে যে, আজকের অনেক সচেতন মানুষ ধর্মকে, এমনকি খোদাকে পর্যন্ত লৌকিক ভাবতে শুরু করেছে। মুসলিম সন্তানরা পর্যন্ত নাস্তিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে।

‘ওহী—ইনহাম বা ঐশ্বীবাণী কিছু নয়, ওসব মানুষেরই মনের কথা, মানুষের অস্তর্ভূত বা Inner Voice— এই বিশাঙ্গ বিশ্বাসটা যেমন নবুও’য়ত ও রেসালাত বিরোধী, তেমনি খোদা বিরোধীও। আধুনিক পাঞ্চাত্যের দর্শন-প্রসূত এই ‘অস্তর্ভূত’ এর কল্পিত বিশ্বাসটার ঘনঘটা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক আকাশকেও প্রায় আবৃত করে ফেলেছে। তাই প্রাচ্যের বহু বিখ্যাত কবি দার্শনিক ‘অস্তর্ভূতের’ ঐ কুবিশ্বাসের অনুপ্রবেশ থেকে নিজেদের চিন্ত্য-চেতনাকে রক্ষা করতে পারেননি; নিজেদের বোধ ও বোধিকে তার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। তাই তারা বলেন, খোদা কথা বলেন না, বরং ‘জনগণের কথাই খোদার কথা।’

বলা দরকার যে, যে সভ্যতা প্রকৃত, যে সভ্যতা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় তা পাঞ্চাত্য নয়, তা প্রাচ্য। কেননা, এই প্রাচ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন সভ্যতার পিতৃপুরুষগণ, হয়রত আদম (আঃ)-থেকে নিয়ে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত। যে যৌগকে তারা খোদার পুত্র খোদা বানিয়েছে, তিনিও এই প্রাচ্যেরই এক নবী। তাঁর ক্রুশে বিন্দু রক্তের মিথ্যা প্রায়চিত্তের গলিত ভিত্তির উপরে গড়ে উঠেছে যে উদ্ধৃট, জাল ও অলীক ধর্মবিশ্বাস, তারই গর্তে জন্ম নিয়েছে পাঞ্চাত্যের দর্শনের সব নৈরাশ্যবাদ ও নাস্তিবাদ।

পক্ষান্তরে, এই প্রাচ্যের প্রত্যেক নবী ও রসূল ছিলেন নৈরাশ্যবাদ ও নাস্তিবাদের প্রকাশ্য দুষ্মন। প্রত্যেক নবীই মানুষের সামনে প্রকাশিত করেছেন মানুষের চরম আশার বাণী : খোদা-প্রাণির পরম আশাসের প্রত্যয়। খোদা ও বান্দার মিলনের শত পবিত্র উদাহরণ।

পবিত্র কোরআন পাঠকারী প্রতিটি মুসলিম নরনারী একথা জানে যে, আল্লাহতায়ালা মুসা (আঃ)-এর মায়ের প্রতি ওহী করেছেন, আল্লাহতায়ালা ঈসা (আঃ)-এর মায়ের প্রতি ওহী করেছেন, আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর উম্মত হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করেছেন। অথচ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের প্রতি ওহী করেন না, — এ কেমন কথা? এ কখনই হতে পারে না। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ بِأَنَّهُمْ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسْرِئُلٌ عَلَيْهِمُ الْمُتَّكِّلُونَ أَلَا

عَنَّا فَوْأَدَ لَا يَخْزُنُونَا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

“নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’ অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের উপর ফিরিশতাগণ নাযেল হয় (এই বলে), ‘তোমরা ভয় করো না, এবং দুঃখিত হইও না এবং সেই জান্মাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৪১ : ৩১)

আল্লাহ নিজে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন :

وَقَالَ رَبُّكُمْ إِذْ عَوْنَىٰ أَسْجَبْتَ لَكُمْ

“এবং তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক বলছেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব” (৪০:৬১)।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَاتِلْنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دُعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلَيْسَ تَحْيِبُونِي وَلَيُؤْمِنُوا بِنِعْلَهُمْ يَرْشِدُونَ ④

“ এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে তখন (বলে দাও যে,) ‘আমি নিকটে আছি । আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপরে ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।”(২:১৮৭)।

এবং আল্লাহ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

ওহী বা ঐশীকালাম মাত্রই শরীয়ত বা ব্যবস্থা-সম্বলিত বাণী নয়। শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে দেওয়া আছে কোরআন করীমের মধ্যে। সুতরাং শরীয়ত সম্বলিত বাণী অবতীর্ণের প্রয়োজন আর নেই। কেননা, কোরআনের পূর্ণ হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই রেখেছেন তাঁর উপরে। কিন্তু, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে মানুষের প্রার্থনার জবাব আল্লাহ অবশ্যই দিয়ে থাকেন। আল্লাহ

তাঁর বান্দার সাথে কথা বলেন। তিনি দেখেন, তিনি শোনেন, সেইভাবে তিনি নিচয় কথাও বলেন।

হ্যরত মির্যা সাহেব বলেছেন :

“এটা কখনোই মনে করো না যে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে আর খোদার ওই অবতীর্ণ হবে না, যা হওয়ার অতীতেই হয়ে গেছে, এবং জহুল কুদুস পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছেন, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হবেন না। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি যে, প্রত্যেক দুয়ারই বন্ধ হতে পারে, কিন্তু জহুল কুদুসের নাযেল হওয়ার দুয়ার কখনও বন্ধ হতে পারে না। তোমরা তোমাদের হাদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে দাও যেন তিনি সেখানে প্রবেশ করতে পারেন।” (কিশ্তি-এ-নৃহ)

‘খোদাতা’লা তোমাদেরকে কখনই ওই-ইলহাম (ঐশীবাণী), মুকালেমা ও মুখাতেবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ) থেকে বঞ্চিত রাখবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল নেয়ামত দান করেছিলেন, সে সমস্তই তিনি তোমাদেরকে দান করবেন।” (কিশ্তি-এ-নৃহ)

..... এবং যেহেতু বুদ্ধিমত্তার পথ ও পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত হয়ে থাকে, সেহেতু কোনও ফিলসফি কেবল যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা খোদাকে চিনতে পারে না। বরং এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই যারা শুধু বুদ্ধি দিয়েই খোদাতায়ালার সন্ধান পেতে চায়, তারা পরিণামে নাস্তিক হয়ে যায়..... এবং খোদাতায়ালার স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।.....সুতরাং কোন ব্যক্তির পক্ষেই ফিলসফির নৌকায় বসে সংশয়ের তুফান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। বরং সে ডুবে মরবেই।..... এখন তেবে দেখ, এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা কিরণ মির্যা ও কত পৃতিগন্ধময় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চিলা ছাড়াই তৌহীদ লাভ সম্ভব।..... কথা এটাই সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জিন্দা খোদার শক্তিসমূহের পরিচয় না পায়, ততক্ষণ

পর্যন্ত, না তার হৃদয় থেকে শয়তান বহিষ্ঠ হয়, না তার হৃদয়ের মধ্যে সত্য তোহিদ প্রবেশ করে, না সে দৃঢ়ভাবে খোদাই অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়। এবং এই পূর্ণ ও পবিত্র তোহিদ একমাত্র আহ্যরত সান্নাম্বাহো আলাইহে ওয়া সান্নামের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।” (হকীকাতুল উহী, পৃঃ ১১৭-১১৮)

‘খাতামান্নবীঙ্গন’ (১)

বিরোধিতা করা হয়, এবং প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয়, ‘হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন খাতামান্নবীঙ্গন। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। অথচ মির্যা সাহেব নবুওয়তের দাবী করেছেন। অতএব, তিনি নবুওয়তের একজন মিথ্যা দাবীদার। তাঁকে মান্য করার প্রশ্নই ওঠে না, তাঁর বিরোধিতা করাই কর্তব্য।’

নবুও’তের এই প্রশ্নটি অধুনা যেন বেশী স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। এর কারণ নানাবিধি। প্রথম, নবুও’ত সম্পর্কিত প্রায় সকলেরই ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ সবাই মনে করে যে, হ্যরত রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর পরে কোন নবীর আগমন ঘটলে আহ্যরত (সাঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদার হানি হবে। তৃতীয়তঃ লোকেরা অনুধাবন করতে চায় না যে, আহ্যরত (সাঃ)-এর উপাধি ‘খাতামান্নবীঙ্গন’ এর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি? চতুর্থতঃ লোকেরা জানতে চায় না যে, নবুও’তের ব্যাপারে হ্যরত মির্যা সাহেবের প্রকৃত দাবী কি, এবং তার স্বরূপ কি?

সাধারণতঃ লোকেরা মনে করে যে, নবী হলৈ তার একটা শরীয়ত থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক নবীই শরীয়তওয়ালা নবী।

কিন্তু, এই ধারণাটা ভুল। কেননা, দুনিয়াতে নবীর আগমন হয়েছে অসংখ্য, বলা হয় লক্ষাধিক। অথচ, শরীয়তের সংখ্যা সেই তুলনায় অতিশয় অল্প। আসমানী কিতাবের সংখ্যাও স্বল্প। হ্যরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর

ঠিক পূর্ববর্তী শরীয়তওয়ালা নবী ছিলেন হ্যরত মুসা (আঃ)। মুসা (আঃ)-এর শরীয়তের অধীনে অনেক নবী এসেছিলেন; যদিও শুধু বনী-ইসরাইলী জাতির জন্য তাঁর আবির্ত্তাব হয়েছিল। তাঁর ভাই হ্যরত হারুণও (আঃ) তাঁর সঙ্গেই নবী ছিলেন। মুসায়ী শরীয়তের অধীন সর্বশেষ নবী ছিলেন হ্যরত ঈসা (আঃ)। ঈসা (আঃ)-এর জন্য কোনও পৃথক শরীয়ত ছিল না। তিনি ছিলেন তওরাতের শরীয়তের তস্দিককারী সর্বশেষ নবী। যেমন, কোরআন শরীফে আছে যে, ঈসা (আঃ) বলছেন : **يَبْنِيَ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ**

يَدَئِي مِنَ التَّوْرِيلِ

'---'হে বনী ইসরাইল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ রসূল, উহার (ভবিষ্যত্বাণীর) সত্যায়ণকারীরূপে যা তওরাত হতে আমার সম্মুখে আছে,---' (৬১ : ৭)

অতএব, দেখা যাচ্ছে, নবী প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। এক, শরীয়তবাহী। দুই, সেই শরীয়তের তস্দিককারী এবং সে কারণে সংস্কারকারীও।

অনেকে এরূপ ধারণাও পোষণ করেন যে, একজন নবী এসেছেন তাঁর ওফাই হয়েছে; অতঃপর আর একজন এসেছেন, তিনিও গত হয়ে গেছেন, অতঃপর আর একজন এসেছেন, গেছেন, অতঃপর আর একজন..... অতঃপর আর একজন..... এমনিধারায় আবির্ত্তাব ও তিরোভাবের পর সর্বশেষ আগমন করেছেন আঁহ্যরত (সাঃ)। সুতরাং, আঁহ্যরত (সাঃ) হচ্ছেন নবীগণের আগমনের ক্রমধারায় সর্বশেষ আগমনকারী নবী, এবং তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না। (যদিও তাঁরা ঈসা (আঃ)-এর আগমনের প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন।)

বিস্তু, সবাই জানেন যে, আবুল আবিয়া (নবীগণের পিতা) হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং তাঁর ভাতুল্পুত্র হ্যরত লুত (আঃ) ছিলেন সমসাময়িক নবী। হ্যরত ইব্রাহিমের (আঃ) দুই পুত্র ইসমাইল (আঃ) এবং ইসহাক (আঃ) ছিলেন সমসাময়িক নবী। একথাও সবারই জানা যে, হ্যরত মুসা (আঃ)-এর সাথে

তাঁর ভাই হ্যরত হারুণ (আঃ) ছিলেন তাঁরই সাহায্যকারী নবী। এবং হারুণ (আঃ) ও ফাত্তেম প্রাপ্তি হন মুসা (আঃ)-এর পূর্বেই। কাজেই নবীগণের আগমনের ক্ষেত্রে একের পর এক 'ক্রমধারার' যে ধারণাটা তা যেমন অযৌক্তিক তেমনি অনৈতিহাসিক। অতএব, এইরূপ ধারণা বাতিল।

হ্যরত মুসা (আঃ) ছিলেন শরীয়তবাহী নবী। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পরে অনেক নবী এসেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সেই নবীগণের আগমনে মুসা (আঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদার কোন হানি হয়নি। অতএব, আহ্যরত (সাঃ)-এর পরবর্তীকালে (যিনি হ্যরত আদম-আঃ-এর জন্মের পূর্ব থেকেই খাতামুরবীস্টন ছিলেন) কোন নবীর আগমন হলে তাঁর (সাঃ) মাকাম ও মর্যাদার হানি হয় না। বরং তা আরও বেশী বৃদ্ধি পায় এবং অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। সে আলোচনা আমরা পরে করছি। আপাততঃ আমরা শুধু একটা কথার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং তা হচ্ছে— যাঁরা 'খাতামারবীস্টন' কথাটির 'নবীস্টন' শব্দ বলতে সকল শ্রেণীর সকল নবীকেই বুঝেন ও অন্যদেরকে বোঝান; তাঁরা কি 'আবুল আবিয়া' কথাটির 'আবিয়া' (নবীস্টন) শব্দেও সকল নবীকেই বুঝেন ও বোঝান? তাঁরা কি হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে সকল নবীর পিতা মনে করেন?

কোরআন করীমে মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে রসূলে পাক (সাঃ) এর। তাঁর তেরশত বৎসর পরে এসেছিলেন মুসায়ী শরীয়তের শেষ নবী হ্যরত ঈসা (আঃ), এ কারণেই, আহ্যরত (সাঃ)-এর তের শ' বৎসর পরে আহ্যরত (সাঃ)-এর শরীয়তের তসদিককারী এক ব্যক্তির আগমন হওয়াও জরুরী ছিল, যাকে গুণগত দিক থেকেই আখ্যায়িত করা হয়েছে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলে। আগমনকালের সময়ের ব্যবধান এবং মোকামের দিক থেকে 'মুসায়ী মসীহ'-এর সঙ্গে যেমন 'মুহাম্মদী মসীহ'-এর সাদৃশ্য বর্তমান, তেমনি উভয়েই শরীয়ত ছাড়া নবী হওয়ার দিক থেকেও সমশ্রেণীর মর্যাদার অধিকারী। তবে মুহাম্মদী মসীহ একজন উম্মতি এবং উম্মতি হয়েই নবী। অতএব, তিনি তাঁর স্তৰ্য প্রভু—নবীর শরীয়তের এক তসদিককারী ও সেই শরীয়তের অধীনে সংস্কারক নবী।

“এ বিষয়ে হ্যৱত মিৰ্যা সাহেব (আঃ) এৱং দাবী হচ্ছে :

“আমি হ্যৱত মুহাম্মদ (সাঃ) এৱং যে স্থানে আমি নবুওয়ত ও রেসালাত সম্পর্কে অস্বীকার জ্ঞাপন কৱেছি, তা শুধু এই অর্থে কৱেছি যে, না আমি স্বতন্ত্র কোন শরীয়তবাহী নবী এবং না আমি স্বীয় অধিকারে কোন নবী। বৱং তা এই যে, আমি আমাৰ রসূলে মুক্তেদা (সাঃ) থেকে বাতেনী ফয়েজ বা গুণ কল্যাণৱাজি হাসিল কৱে এবং তাৱই নামে আখ্যায়িত হয়ে তাৱই মাধ্যমে আমি খোদাৱ কাছ থেকে গায়েবেৱ জ্ঞান লাভ কৱেছি, তাই আমি রসূল ও নবী। কিন্তু আমাৰ কোন নতুন শরীয়ত নেই।” - (এক গল্তি কা ইজালা)

“হঁয়া, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এবং তা কথনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতা’লাৰ তৱফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাৱ এই সকল আশীষ ও কল্যাণ আমাৰ প্ৰতি প্ৰত্যক্ষভাৱে হয়নি বৱং আসমানে এক পৰিত্ব অস্তিত্ব আছেন যঁৰ রহানী ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ আমাৰ মধ্যে ক্ৰিয়াশীল হয়েছে অৰ্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেৱ। তাৱ উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং তাৱ মধ্যে বিলীন হয়ে তাৱ মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত হয়ে আমি নবীও হয়েছি, রসূলও হয়েছি। অৰ্থাৎ প্ৰেৱিতও হয়েছি, এবং খোদাৱ কাছ থেকে অদৃশ্যেৱ বা গায়েবেৱ সংবাদ লাভকাৰীও হয়েছি। এবং এৱং দৱশন খাতামাৱৰীসনেৱ মোহৰও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কেননা, আমি প্ৰতিফলিত ও প্ৰতিবিশ্বলপে প্ৰেমেৱ আয়নাৰ মধ্য দিয়ে ঐ নাম লাভ কৱেছি।” - (এক গল্তি কা ইজালা)

‘সুতৱাৎ যে ব্যক্তি দুষ্টামি কৱে আমাৰ বিৱৰণক্ষে এই অভিযোগ উথাপন কৱে যে, আমি ‘নবুও’ত ও রেসালাতেৱ দাবীদাৱ, সে মিথ্যাবাদী এবং তাৱ এই জাতীয় ধাৱণা অপবিত্ৰ। বুৰুজী (প্ৰতিবিষ্ট) আকাৱে আমাকে নবী ও রসূল কৱা হয়েছে। এবং এইভাৱে খোদা বাৱ আমাৰ নাম নবীউল্লাহ এবং রসূলউল্লাহ

ରେଖେଛେନ, କିମ୍ବୁ ବୁରୁଙ୍ଗୀ ଆକାରେ; ଏର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ନଫସ ବା ସତ୍ତା ନେଇ, ଆହେନ ମୁହାମ୍ମଦ ମୁନ୍ତଫା ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହେ ଓଯା ସାନ୍ତାମ। ଏଇ କାରଣେ ଆମାର ନାମ ମୁହାମ୍ମଦ ଏବଂ ଆହ୍ମଦ ହେଁଥେ। ସୁତରାଂ ନବୁଓ'ତ ଓ ରେସାଲାତ ଅପର କାରାପ ନିକଟ ଯାଯନି, ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ)-ଏର ଜିନିସ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ)-ଏର ନିକଟେଇ ରଯେ ଗେଛେ: ଆଲାଇହେସ ସାଲାତୋ ଓଯାସ୍‌ସାଲାମ।” – (ଏକ ଗଳ୍ପିତ କା ଇଜାଲା) ।

“ଆମି ଯଦି ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ)-ଏର ଉଷ୍ମତ ନା ହତାମ, ଏବଂ ତୌର ଅନୁସାରୀ ନା ହତାମ, ଅଥଚ ଆମାର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମେର ଉଚ୍ଛତା ଓ ଓଜନ ଯଦି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପରିତେର ସମାନଓ ହତୋ, ତଥାପି ଆମି କଖନଓ ଖୋଦାର ସହିତ ବାକ୍ୟାଲାପ କିଂବା ତୌର ବାଣୀ ଲାଭେର ସମାନେର ଅଧିକାରୀ ହତେ ପାରତାମ ନା। କେନନା, ଏଥିନ ମୁହାମ୍ମଦୀ ନବୁଓ'ତ ଛାଡ଼ା ବାକୀ ତାମାମ ନବୁଓ'ତେର ଦରଜା ବଞ୍ଚି ହେଁ ଗେଛେ। ଆର କୋନଓ ଶରୀଯତବାହୀ ନବୀ ଆସତେ ପାରେ ନା। କିମ୍ବୁ ଶରୀଯତ ଛାଡ଼ା ନବୀ ଆସତେ ପାରବେନ, ଅବଶ୍ୟ ତିନି ଯଦି ରସ୍ତେ କରୀମ (ସାଃ)-ଏର ଅନୁସାରୀ ହନ। ଏହିଭାବେ ଆମି ଏକଇ ସଙ୍ଗେ ଏକଜନ ଉଷ୍ମତିଓ ଏକଜନ ନବୀଓ। ଆମାର ନୁବୁଓ'ତ ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ)-ଏର ନବୁଓ'ତେର ପ୍ରତିବିଷ, ତୌର ନବୁଓ'ତ ବାଦ ଦିଯେ ଆମାର ନବୁଓ'ତେର ‘କୋନଓ ଅଣ୍ଟିତ ନେଇ। ଇହା ତୋ ସେଇ ମୁହାମ୍ମଦୀ ନବୁଓ'ତ ଯା ଆମାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଁଥେ।’” – (ତାଜାନ୍ତିକାତେ ଇଲାହିଯା) ।

ମୁହାମ୍ମଦୀ ମସିହ ଓ ମାହଦୀ (ଆଃ) ଆରାପ ଘୋଷଣା କରେଛେନ :

“ଏହି ଅଧିମକେ ତୋ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେଇ ପ୍ରେରଣ କରା ହେଁଥେ ଯେ, ମେ ଯେନ ଆନ୍ତାହର ସୃଷ୍ଟିର କାହେ ଏହି ପଯଗାମ ପୌଛିଯେ ଦେଯ ଯେ, ଦୁନିଆର ବୁକେ ଯେ ସକଳ ଧର୍ମ ବର୍ତମାନ ରଯେଛେ, ତାର ମଧ୍ୟେ ମେହି ଧର୍ମଇ ସତ୍ୟର ଉପରେ ଆହେ ଏବଂ ଖୋଦାତା’ଲାର ଇଚ୍ଛାନ୍ୟାୟୀ ବିଦ୍ୟମାନ ରଯେଛେ ଯା କୁରାଅନ କରୀମ ନିଯେ ଏସେହେ। ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣେର ଘରେ ଦାଖିଲ ହୁଏଯାର ଦରଜା ହଚେ :

ଲା ଇଲାହା ଇଲାହାହୋ ମୁହାମ୍ମଦୁର ରସୁଲିଲାହା”

– (ହିଜାତୁଲ ଇସଲାମ) ।

‘খাতামান্নবীঈন’ (২)

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ قِنْ رِجَالُكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহর
রসূল এবং নবীগণের মোহর; এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।”(৩৩:৪১)

(এই আয়াতে করীমায় ‘রসূলাল্লাহ’ ও ‘খাতামান্নবীঈন’ কথা দু’টির
প্রথমটিতে (লাম) এর উপরে এবং দ্বিতীয়টিতে (মিম) এর উপরে যবর
(আ-কার) এসেছে এবং তা আরবী ব্যাকরণের নিয়মে এসেছে। স্বতন্ত্রভাবে
কথা দু’টির উচ্চারণ হচ্ছে- ‘রসূলাল্লাহ’ এবং ‘খাতামান্নবীঈন’।)

এই আয়াতে ‘খাতামান্নবীঈন’ এ ‘খাতাম’ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে
'শ্রেষ্ঠত্ব' জ্ঞাপকার্থে। এখানে শব্দটি প্রশংসা ও সম্মান প্রকাশার্থে ব্যবহৃত
হয়েছে, 'নিন্দা' প্রকাশার্থে নয়। কিন্তু যাঁরা এখানে শব্দটির অর্থ করেন 'শেষ'-
তাঁরা তেবে দেখেন না যে, 'শেষ' শব্দটির বহুল ব্যবহার করা হয় 'নিন্দাসূচক'
অর্থে। যেমন লোকটা পাজির শেষ (চূড়ান্ত); লোকটি শেষ (উৎসর্গ) হয়ে গেল;
ওরা লোকটাকে শেষ করে দিল (মেরে ফেললো); পোকায় ক্ষেত্রের ফসল
শেষ (নষ্ট) করে দিল; ছেলেটা সংসর্গদোষেই শেষ (বিপথগামী) হয়ে গেল --
--ইত্যাদি। তাছাড়া আ-কার, ই-কার----পরিবর্তনে যে শব্দের এবং
শব্দার্থের তারতম্য ঘটে, এই সহজ কথাটা তাঁরা কেন বুঝতে চান না?

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে-

যে ‘খাতাম’ শব্দের অর্থ ‘শেষ’ নয় (বরং মোহর বা আংটি) এবং যে
'শেষ' শব্দ নিন্দাসূচক অর্থেই ব্যবহৃত হয় বেশী, তাকেই ‘খাতাম’ শব্দের অর্থ
ধরে নিয়ে কেন তা প্রয়োগ করা হচ্ছে আইহ্যরত (সাঃ)- এর উপরে? এবং এই

উপায়ে আহ্যরত (সাঃ)–এর অতি পবিত্র নাম ও মোকামের কেন হানি করা হচ্ছে?

কোরআন, আহাদীস এবং বুজগানে উম্মতের সাহায্য নিব এই বিষয়টির ফয়াসালার জন্য। প্রথমে কোরআন করীমের সাহায্য গ্রহণ করবো আমরা। কেননা কোরআনই হচ্ছে কোরআনের উৎকৃষ্ট তফ্সীর। পাক কোরআনে আটটি আয়াতে ‘খাতাম’ শব্দের ব্যবহার এসেছে :

(১) আলোচ্য ‘খাতামারবীদ্বন্দ্ব’ সম্বলিত আয়াত–(৩৩ : ৪১),

(২)

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَعْيِهِمْ

“আল্লাহ্ তাদের হৃদয় সমূহের উপর এবং কর্ণসমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন---” (২ : ৮)

(৩)

وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ

“---এবং তোমাদের অন্তরের উপর মোহরাক্ষিত করে দেন---” (৬ : ৪৭)

(৪)

خَتَمَ عَلَى سَعْيِهِ وَقَلْبِهِ

“---তার কর্ণের ও হৃদয়ের উপর মোহরাক্ষিত করে দিয়েছেন---”

-(৪৫:২৪)।

(৫)

فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتَمُ عَلَى قَلْبِكَ

“---তোমার অন্তরের উপর মোহর মেরে দিতে পারেন---” (৪২: ২৫)

(৬)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ

“—আমরা তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেব—” (৩৬:৬৬)।

(৭)

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ

“তাদেরকে মোহরাক্ষিত বিশুদ্ধ সূরা হতে পান করানো হবে” (৮৩ : ২৬)

(৮)

خَتَمْهُ مِنْكَ

“উহার সীলমোহর হবে কস্তুরীর—” -(৮৩ : ২৭)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতগুলির প্রত্যেকটিতেই ‘খাতাম’ এবং তা থেকে সাধিত শব্দের অর্থ এসেছে ‘মোহর’ ‘মোহরকৃত’ ‘সীলমোহর’ এবং কোন একটিতেও ‘খাতাম’ অর্থ শেষ বা সমাপ্ত করা হয়নি। যারা ‘খাতামাল্লবীস্নের’ খাতাম শব্দের অর্থ সীল (Seal) থেকে সীলড (Sealed) করতে চান তাদেরকে অনুরোধ করবো যে, তারা যেন ৭ ও ৮ নং উদ্ধৃতির প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দেন। এটা করলে, খোদা চাহে তো, তাঁদের হৃদয় খুলে যাবে এবং তাঁরা খাতামাল্লবীস্নের তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন। যাহোক, এটা অতি সুস্পষ্ট যে, কোরআনের মতে ‘খাতাম’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘মোহর’, ‘শেষ’ বা ‘সমাপ্ত’ নয়। ‘শেষ’ পরবর্তীকালের প্রচলিত একটি অর্থ; কিন্তু তাও আরবী অভিধান সম্মত নয়।

অতঃপর, আমরা হাদীস শরীফের সাহায্য নিব।

হযরত রসুলে পাক (সা:) তাঁর শিশু-পুত্র ইব্রাহিম এর মৃত্যুতে বলেছিলেন :

‘ইব্রাহিম বেঁচে থাকলে সে সত্য নবী হতো।’

তাদের আলেমরা এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে চেষ্টা করেন যে,- যেহেতু রসূলগ্লাহুর পর আর কেউ নবী হতে পারবে না, সেহেতু শিশু ইব্রাহিমকে আল্লাহ মৃত্যু দান করেছেন। স্পষ্টতঃই এইরূপ যুক্তি অস্ত, বিভাস্তিকর ও অচল। কেননা, তাদের ঐ যুক্তিটার মাধ্যমে প্রকারান্তরে এই ধারণাটাই ব্যক্ত করা হয় যে,- ‘আল্লাহ ইব্রাহিমের জন্মের ব্যাপারে মারাত্মক এক ভুল করে বসেছিলেন এবং তা হলো : আহ্যরত (সাঃ)-এর পর আর কেউ নবী হবে না, এটা ভুল গিয়ে আল্লাহ এমন এক শিশুকে পৃথিবীতে পাঠালেন, যে বেঁচে থাকলে সত্য নবী হবে। এবং এই ভুলটা সংশোধনের জন্য আল্লাহ উপায়ন্তর না দেখে তাড়াতাড়ি শিশু ইব্রাহিমকে মৃত্যু দান করলেন।’ বলাই বাহ্য্য, এটা একটা খোদা-বিরোধী ধারণা। অতএব পরিত্যাজ্য। নবী হতে পারবেন না বিধায় যদি শিশু ইব্রাহিমকে মৃত্যু দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁকে সৃষ্টি না করলেই তো পারতেন আল্লাহতায়াল্লা। তাতে অস্ততঃ ঐ পবিত্র শিশু-নবীর মাতা উস্মুল মুমেনীন মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) পুত্র হারানোর শোক পেতেন না, শোক পেতেন না স্বযং আল্লাহর রসূল (সাঃ)। সুতরাং, তাদের আলেমদের ঐ যুক্তিটার কানাকড়ি মূল্যও নেই, না এ জগতে না আধ্যাত্মিক জগতে।

‘খাতামানবীস্টন’ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয় হিজরী পঞ্চম সনে; আর শিশু-ইব্রাহিমের ওফাত হয় নবম হিজরীতে। সুতরাং ‘খাতামানবীস্টন’ অর্থ যদি ‘নবীগণের শেষ’ বা ‘সর্বশেষ নবী’ হতো তাহলে আহ্যরত (সাঃ) কিছুতেই বলতেন না যে, ‘ইব্রাহিম বেঁচে থাকলে সত্য-নবী হতো।’

এই হাদীসের ব্যাখ্যায়-

হ্যরত ইমাম আলী কুরী (রহঃ) বলেছেন : ‘ইব্রাহিমের নবী হওয়া সম্পর্কিত আহ্যরত (সাঃ)-এর হাদীস কোনভাবেই ‘খাতামানবীস্টন’ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, এই হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে-

(ক) অনুরূপ নবী শরীয়ত রাখিত করতে পারবেন না, এবং

(খ) তিনি হবেন আহ্যরত (সাঃ)-এর উস্মতি।

হ্যরত আলী (রাঃ)-এর হাওয়ালা দিয়ে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হ্যরত শাহবুদ্দীন আহমদ হায়ার আল হাশমী (রহঃ) বলেছেন :

হ্যরত রসুলুল্লাহ (সা:)—এর পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু হলে তিনি হ্যরত মারিয়া কিবতিয়াকে (রাঃ) ডাকলেন। তিনি (উশুল মুমেনীন) এসে তাঁর পুত্রকে গোসল দিলেন ও কাফন পরালেন। তাকে কোলে করে গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন রসুলুল্লাহ (সা:), সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)। রসুলুল্লাহ (সা:) কবরস্থরে গেলেন এবং শিশুর লাশ দাফন করলেন। দাফনের পর, তার কবরের উপর হাত রেখে বললেন : ‘আল্লাহর কসম, নিশ্চয় সে নবী এবং নবীর পুত্র।’।

(আল ফতওয়া আল হাদীসিয়া : পৃ-১২৫)

এই ঘটনা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পেশ করে যে, ‘খাতামানবীস্টন’— এর অর্থ ‘নবীগণের শেষ’ বা ‘সর্বশেষ নবী’ নয়। হলে, আহ্যরত (সা:) স্থীয় পুত্রকে ‘নবী’ বলে উল্লেখ করতেন না।

কেউ কেউ ‘খাতামানবীস্টন’ কথাটিকে ‘খাতেমানবীস্টন’ পড়তে চান। কেউ কেউ জিদের বশেও। কিন্তু ‘প্রজ্ঞা-নগরীর দ্বার’ হ্যরত আলী (রাঃ) এইরূপ ('তে' এর নীচে জের দিয়ে) ‘খাতম’ পাঠ পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, স্পষ্টতঃই এটা একটা প্রক্ষেপ। এবং কোরআনের মধ্যে প্রক্ষেপ ঢোকানোর প্রচেষ্টা অবশ্যই গঠিত ও কদর্য। সুতরাং পরিত্যাজ।

‘খাতামুল আউলিয়া’ হ্যরত আলী (রাঃ)

সাইয়েদনা খাতামুনবীস্টন (সা:) বলেছেন :

“আমি খাতামুল আউলিয়া,

তুমি, হে আলী, খাতামুল আউলিয়া।”

‘আমি নবীদের খাতাম (মোহর)

তুমি, হে আলী, ওলীদের খাতাম (মোহর)।’

‘খাতাম’ শব্দের অর্থ যদি ‘শেষ’ হয়, তাহলে এই হাদীসের অর্থ হবে— আমি নবীদের শেষ, হে আলী, তুমি ওলীদের শেষ।

কিন্তু, এই অর্থ কি কেউ গ্রহণ করবেন? কেউ কি স্থীকার করবেন যে, হ্যরত আলী (রাঃ)—এর পরে উশুলে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আর কোন ওলী

আল্লাহর আবির্ত্বাব ঘটেনি? নিচয়, স্বীকার করবেন না। তাহলে, এ কথা মানতেই হবে যে, ‘ওলীগণের খাতাম’ এর পরে যদি ওলীর আবির্ত্বাব ঘটে থাকে, এবং ঘটেছেও বহু। তাহলে ‘নবীগণের খাতাম’ এর পরে নবীর আবির্ত্বাব ঘটবে না কেন? অবশ্যই ঘটবে। বস্তুতঃ খাতামুল আউলিয়া হ্যরত আলী (রাঃ)-এর পরে ওলীআল্লাহু আগমনের এবং হ্যরত খাতামুরবীঈন রসূলুল্লাহ (সা�)-এর পরে তাঁর উশ্মতের মধ্যে নবী উল্লাহু আগমনের এক শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণীই নিহিত আছে উক্ত হাদীসে।

আরবী ব্যাকরণ অনুসারে ‘খাত্ম’ হতে ‘খাতাম’ শব্দ উদ্ভূত, যা ইসমে আলা (যন্ত্রবাচক বিশেষ্য-Instrumental noun) স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার অর্থ মোহর, আংটি ইত্যাদি। শব্দটি যখন বহুবচনের দিকে ‘মুযাফ’ বা সমন্বযুক্ত হয় তখন এর অর্থ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম; ছাড়া অন্য আর কোন অর্থে এর ব্যবহার হয় না। আরবী সাহিত্য বা বাগধারায় এইরূপ ব্যবহারই করা হয় ‘খাতাম’ শব্দের। যেমন, মহাকবি আবু তামামকে ‘খাতামুশ শোয়ারা’- কবিদের খাতাম বা সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। হ্যরত ইমাম শাফী (রঃ)-কেও বলা হয় - ‘খাতামুল আউলিয়া’। হ্যরত মুহী উদ্দীন ইবনুল আরাবী (রঃ)কে বলা হয় খাতামুল আয়েমা ও ‘খাতামুল আসফিয়া’- (দ্রঃ ফতুহাতে মক্কীয়া)। হ্যরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ)-কে বলা হয় ‘খাতামুল মুহাদ্দেসীন’ তদুপরি, সেই হাদীসও অনেকের জানা আছে যাতে আঁহ্যরত (সা�) হ্যরত আবাস (রাঃ)-কে বলেছেন ‘খাতামুল মুহাজীরীন’। সুতরাং বহুবচনের দিকে ‘মুযাফ’ করা হলৈ ‘খাতাম’ শব্দের অর্থ যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাড়া অন্য কিছু হয় না, তজন্য বোধ করি, আর কোন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই। তাই এ নিয়ে কেউ কুটতর্ক করলে তা আকেলমান্দের কাছে নির্বর্থক সাব্যস্ত হবে।

অতএব, ‘খাতামুরবীঈন’ এর অর্থ হচ্ছে- ব্যাকরণসিদ্ধ ও নির্ভূল অর্থ হচ্ছে- নবীগণের খাতাম বা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এবং বলা বাহ্য্য, তিনিই হচ্ছেন আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা ও প্রভু হ্যরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহোতায়ালা আলাইহে ও সাল্লাম।

খাতামুন্নবীঙ্গন (সাঃ)-এর পরে ‘উম্মতি—নবী’

শ্রদ্ধাস্পদ মওলানা আশরাফ আলী সাহেব থানবী কৃত ‘নশরুত তীব কি যিক্রিয়াবিয়ীন হাবিব (সাঃ)’ কিতাবে এক হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া আছে এইভাবে :

“হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সূন্দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক একবার মুসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন : তুমি বনি ইসরাইলদের জানিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি আহ্মদ (আঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহানামে প্রবেশ করাবো। হযরত মুসা (আঃ) আরজ করলেন, আহ্মদ কে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন : হে মুসা, আমার ইঞ্জত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করিনি। আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও জর্মান এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইঞ্জত ও গৌরবের শপথ, আমার মাখলুকের জন্য জাহান হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তার উম্মত জাহানে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মুসা (আঃ) আরজ করলেন : হে আল্লাহ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন : সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। মুসা (আঃ) পুনরায় আরজ করলেন : তবে আমাকে সেই নবীর এক উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন : তুমি তাঁর পূর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ। আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জাহানে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব।” - (হলিয়া)।

(দ্রঃ—‘যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা’ : মওলানা আশরাফ আলী থানবী : অনুবাদ-মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ বাংলাদেশ।)

এই হাদীস থেকে যে ক'টি সত্য দিনের আলোর মত পরিক্ষার হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে :

(১) মুহাম্মদীয় উম্মতের মধ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটবে;

(২) সেই নবী হবে এই উচ্চতের মধ্য থেকে, পূর্ববর্তী কোন উচ্চতের
মধ্য থেকে নয়;

(৩) পূর্ববর্তী কোন নবীকে এই উচ্চতের মধ্যে শামিল করা হবে না;

(৪) পূর্ববর্তী কোন নবীকে একজন উচ্চতি অথবা নবী হিসেবে পুনরায়
এই উচ্চতের মধ্যে প্রেরণ করা হবে না;

(৫) নবী অথবা উচ্চতি যে কোনভাবে এই উচ্চতের মধ্যে পুনরাগমনের
জন্য মুসা (আঃ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়নি; হয়নি এই জন্য যে, তাঁর
(আঃ) আগমন পূর্বেই ঘটে গেছে।

অতএব, যাঁরা পূর্ববর্তী উচ্চতের এক নবী ইসা (আঃ)-কে আসমানে
জীবিত থাকার কল্পনা করে, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন
তাঁদেরকে হতাশ হতে হবে। সম্পূর্ণ হতাশ হতে হবে। কারণ তাদের একপ
ধারণার কোন ভিত্তি নেই; না কোরআনে, না হাদীসে। এমনকি তা সাধারণ
বুদ্ধি-বিবেকেও গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মুহাম্মদী উচ্চতে শামিল হওয়ার জন্য মুসা (আঃ)
এর দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেননি। অথচ কে বা কারা কোথা থেকে এক গল
আবিক্ষার করেছে যে, ইসা (আঃ) আহ্যরত (সাঃ)-এর উচ্চত হওয়ার জন্য
দোয়া করেছিলেন, আর তাই আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে রেখে দিয়েছেন।
আসলে এগুলো অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

‘লা নবীয়া বাদী’

অতঃপর আমরা ‘লা নবীয়া বাদী’- ‘আমার পঁরে নবী নাই’- হাদীসের
আলোচনা করতে চাই।

হ্যরত রসুলল্লাহ (সাঃ) এই কথা বলেছিলেন হ্যরত আলী (রাঃ)-
তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে। এই যুদ্ধযাত্রায় হ্যরত আলীকে (রাঃ) সঙ্গে নেয়া
হয়নি। তিনি মদীনাতে আহ্যরত (সাঃ)-এর প্রতিনিধিরূপে থেকে গিয়েছিলেন।

যুদ্ধে যেতে না পারায় বীরশ্রেষ্ঠ আসাদুল্লাহ আলী (রাঃ) স্বত্বাবতই মনঃক্ষুণ্ণ
হয়েছিলেন।^১ তদুপরি, মুনাফেকরাও তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্যুপ করছিল। তাই তিনি
মদীনার বাইরে রসূল করীম (সা�)-এর নাগাল ধরে তাঁর কাছে যুদ্ধে যাওয়ার
জন্যে আবেদন করলেন। তখন তাঁকে রসূলে পাক (সা�) বলেছিলেন- দেখ
আলী, তুমি তো আমার কাছে ঠিক তেমনি, যেমন হারুণ ছিল মুসার কাছে।
তবে, আমার বাদে নবী নাই।’ এখানে ‘আমার বাদে নবী নাই’- এই কথা
বলবার কোন প্রয়োজন দৃশ্যতঃ ছিল না। কিন্তু, না বললে একটা ভুল বুঝাবুঝির
আশঙ্কা থেকে যেত। লোকেরা ধারণা করতে পারতো যে, আলীও বুঝিবা
হারুণের মতই একজন সহযোগী নবী।

হযরত মুসা (আঃ) তূর পাহাড়ে যাত্রার প্রাক্কালে হযরত হারুণ (আঃ)-
কে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর খলীফারূপে। কিন্তু, ফিরে এসে যখন দেখলেন যে,
তাঁর উচ্চত হারুণ (আঃ) থাকা সত্ত্বেও একটা বাছুর পূজা শুরু করে দিয়েছে,
তখন মুসা (আঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে হারুণ (আঃ) কে বলেছিলেন- ‘বেছামা
খালাফিতুমুনি মিম বা’দী’- (৭:১৫০)- ‘তুমি আমার ‘বাদে’ খারাপ খেলাফত
বা প্রতিনিধিত্ব করেছ’। এখানে এই ‘বাদ’ শব্দের অর্থ ‘পরে’ বা ‘মৃত্যুর পরে’
নয়, বরং অনুপস্থিতিতে। এবং হারুণ (আঃ)-এর এই প্রসঙ্গ টেনেই আঁহযরত
(সাঃ) বলেছিলেন যে, আমার ‘বাদে’ নবী নাই, যদিও মুসার ‘বাদে’ হারুণ
ছিলেন নবী। অর্থাৎ মুসা (আঃ)-এর জীবদ্ধশায় তাঁর ‘বাদে’ বা অনুপস্থিতিতে
তাঁর খলিফা হারুণ নবী হলেও আঁহযরত (সাঃ)-এর জীবদ্ধশায় তাঁর (সাঃ)
বাদে বা অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি আলী নবী ছিলেন না। অতএব, এই
হাদীসের ‘বাদ’ শব্দের অর্থ অনুপস্থিতি’- ‘পরে’ বা ‘মৃত্যুর পরে’ নয়। কেননা,
হারুণ (আঃ)-এর উফত হয়েছিল মুসা (আঃ) বেঁচে থাকতেই। এই হাদীসের
অন্য পাঠে আছে- ‘লাছতা নাবীআ’- এর দ্বারা পরিকার হয়েছে যে, এই কথা
খাস করে আলীর (রাঃ) জন্যই ছিল।’

লায়হা নবীয়ন বাদী- হাদীস নিয়ে কথা উঠেছিল, কিংবা উঠতে পারে,
কুট তর্কও উঠতে পারে, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় উম্মুল মুমেনীন হযরত
আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছিলেন :

قُولُوا إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا تَقُولُوا لَمْ نَرَى بَعْدًا۔

‘तौके खातामुन्वीदिन बल, किस्तु एकथा बल ना ये, तौर परेन नवी नाइ।’
(दुर्गे मनसुर, ५ खंड : १०४ पृष्ठा)

आसले, एथन ये खटका सृष्टि हयेछे ता हादीसे ब्यबहत ‘ला’ कथाटिर प्रकृत अर्थ नियो। साधारणताबे ‘ला’ अर्थ नाइ। अतएव, ए क्षेत्रे एर अर्थ करा हयेछे ‘सम्पूर्णरूपे नाइ’। किस्तु, आरबी भाषाय ब्यबहत एइरप ‘ला’ एर अर्थ सब समय वा सर्वत्र ‘सम्पूर्णरूपे नाइ’ करा हय ना; करा हय आंशिक अर्थे। एই हादीसेओ ‘ला’ ब्यबहत हयेछे आंशिक अर्थे। येमन हादीसे आছे : “ला ईमाना लेमान ला आमानाता लाह,

ओया ला द्विना लेमान ला आहूदा लाह।”

‘यार मध्ये आमानतदारी नेइ तार कोन ईमान नेइ, एवं ये प्रतिज्ञाभঙ्ग करेता तार कोन धमहि नेइ।’

स्पष्टतःइ, एই हादीसे ‘ला’ कथाटि ‘सम्पूर्णरूपे नाइ’ अर्थे ब्यबहत हयनि, ब्यबहत हयेछे ‘आंशिक’ अर्थे। अन्यथाय, आमानत खेयानतकारीके पाका बेस्यमान एवं प्रतिज्ञाभঙ्गकारीके काफेर बलते हवे। किस्तु, एइरप कि केउ बलेन? बलेन ना।

‘लाच्छालाता इल्ला बिल हजुरिल कल्ब’ -

‘हजुरी कलब’ छाडा नामाज नाइ।’

एই हादीसेओ ‘ला’ अर्थ ‘सम्पूर्णरूपे नाइ’ नय। एवं ता केउ करेनउ ना। करले, सग्गवतः वह नामाजी मानुषके नामाज छेड़े दिते हवे। किस्तु देबेन कि कोन मुच्छुली नामाज छेड़े? देबेन ना। वरं प्रत्येकेह चेष्टा करते थाकबेन एमनकि जीवनतर, याते नामाजेर मध्ये ‘हजुरी कल्ब’ सृष्टि हय। सूतरां, ‘ला नवीया’ हादीसेर ‘ला’ अर्थ ‘सम्पूर्णरूपे नाइ’ नय; एरप अर्थे हजुर (साः) ता ब्यबहार करेननि। करले तौर पूत्र इब्राहिमके नवी बलतेन ना। ईसानवीउल्लाहर (आः) आगमनेर भविष्यद्वागीउ करतेन ना।

इस्लामेर इतिहासे एकटि कथा प्रबाद वाक्येर मत ब्यबहत हये आसछे। कथाटि हलो :

‘লা ফাতা ইল্লা আলী লা সাইফা ইল্লা জুলফিকার’- অর্থাৎ আলী ছাড়া যোদ্ধা বা জওয়ান নেই, জুলফিকার ছাড়া তলওয়ার নেই। স্পষ্টতঃই এখানে ‘লা’ (নেই) ব্যবহৃত হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনার্থে ‘পুরোগুরি নেই’ অর্থে নয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে আছে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

‘এয়া হালাকা কিস্রা ফালা কিস্রা বা’দাহ

ওয়া এয়া হালাকা কায়সার ফালা কায়সারা বা’দাহ’-

-(বোখারী : কিতাবুল দ্বিমান)

‘যখন কিস্রা মারা যাবে তখন তারপর আর কেউ কিসরা হবে না। এবং যখন কায়সার মারা যাবে তখন তার পরে আর কেউ কায়সার হবে না’-

এই হাদীসেরও সুম্পষ্ট তাৎপর্য এটাই যে, আঁহ্যরত (সাঃ) বলেছেন যে, বর্তমান কিস্রার মত আর কোন কিস্রা হবে না, বর্তমান কায়সারের মত আর কোন কায়সার হবে না।

এখানেও ‘ফালা বা লা’ ব্যবহৃত হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক অর্থেই। অন্যথায় এই হাদীস ইতিহাসবিরুদ্ধ প্রমাণিত হবে। কেননা, পারস্যে কিস্রার পর কিসরা হয়েছে, বংশানুক্রমিকভাবে হয়েছে। রোমেও তেমনি কায়সারের পর কায়সার হয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, আঁহ্যরত (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন, ‘লা নবীয়া বাদী’। কিন্তু, এই কথা সহীহ হাদীসসমূহের কোন কেতাবে নেই। তবু যদি কেউ বলেন যে, এই হাদীস সহীহ, তবে তাঁকে মানতেই হবে যে, এই হাদীসের অর্থ হবে, ‘আমার অনুপস্থিতিতে বা অব্যবহিত পরে কোন নবী নেই, কিংবা আমার পরে কোন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নবী নেই, কোনও নতুন শরীয়তী নবী নেই।’ এক কথায় আঁহ্যরত (সাঃ)-এর পরে এক তাঁর উচ্চতি ছাড়া নতুন কোন নবীও নেই, উচ্চতও নেই।

‘আকেব’ এবং ‘আখের’

বলা হয় যে, তিরমিয়ী শরীফের এক হাদীসে আছেঃ

‘আনাল আকেবু আল্লায়ি লায়ছা বা’দাহ নবীয়ুন’-

(আমি আকেব যার পরে কোন নবী নেই)।

কিন্তু, হাদীস বলে কথিত এই বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়। কেননা, এই বয়ানের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন সুফিয়ান বিন আইনিয়া এবং তিনি এটি সংগ্রহ করেছেন যুহুরীর কাছ থেকে। সুফিয়ান বিন আইনিয়া সম্পর্কে বলা আছে— ‘এই বর্ণনাকারীর অভ্যাস ছিল কথা বাড়িয়ে বলার (তদলীছ করার)। ইমাম আহ্মদ বলেছেন যে, যুহুরী থেকে বর্ণনার মধ্যে তিনি ভুল করেছেন (এবং আকেব শব্দ সম্বলিত এই বর্ণনাটিও তিনি সংগ্রহ করেছেন যুহুরীর কাছ থেকেই)। ইয়াইয়াহ বিন সাফিদ বলেছেন ‘আমি সাক্ষ্যদান করছি যে, সুফিয়ান বিন আইনিয়ার শৃতিদ্রংশ হয়েছিল হিঃ ১৯৭ সনে, এবং এই ঘটনার পরে তাঁর কাছ থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার কোনটাই সঠিক বা কঙ্গুনিষ্ঠ নয়। (দ্রঃ-মিয়ানুল ইতেদাল : ২ য খণ্ডঃ পৃঃ ৩৯৭-হায়দ্রাবাদ)।

আবার, যুহুরী সম্পর্কেও বলা আছে যে, তিনিও মাঝে মধ্যেই তদলীছ (কথা বাড়িয়ে বর্ণনা) করতেন। (প্রাগুক্তি : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ১৪৬)।

‘আকেবুল্লায়ি লায়ছা বা’দাহ নবীয়ুন’— কথাটি আঁহরত (সাঃ)-এর নয়— বর্ণনাকারীর নিজের। কেননা, শামায়েল তিরমিয়ী শরীফে (পৃঃ ২৬) ‘আকেবুল্লায়ি লায়ছা বা’দাহ নবীয়ুন’ কথাটির মাথায় লেখা আছে ‘কাউল্য যুহুরী’— (ইহা যুহুরী বলেছেন)। অতএব, ইহা হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর কথা নয়। এছাড়াও, মজার ব্যাপার এই যে, তিরমিয়ী মুজাতাবায়ী, যা হিঃ ১৩৬৬ বা তার পূর্বে ছাপা হয়েছিল তাতে ঐ বর্ণনায় আছে— ‘ওয়াল আকেবুল্লায়ি লায়ছা বা’দাহ নবীয়ুন” (অর্থাৎ ‘আকেব’ তিনি তাঁর পরে আর কোন নবী নেই)। কিন্তু ঐ তিরমিয়ীর পরবর্তীকালে ছাপানো সংস্করণে লিখা হয়েছে— ‘আল আকেবুল্লায়ি লায়ছা বা’দী নবীয়ুন’— অর্থাৎ ‘আমি আকেব আমার পরে কোন নবী নাই।’ এখানে ‘বা’দাহ’ (নামপূরুষ) পরিবর্তন করে করা হয়েছে ‘বা’দী’ (উত্তম পূরুষ)— উদ্দেশ্য, যাতে বলা যায় যে, কথাটি স্বয়ং হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন। আচর্য যে, ‘তাদের আলেমরা’ খোদ আঁহরত (সাঃ)-এর পবিত্র শানের উপরে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে বসে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে। কিন্তু, তাদের জন্য আফসোস যে, তাদের

ইত্যাকার প্রক্ষেপের অপপ্রয়াস সব ধরা পড়ে যায় হযরত মসীহ মাওউদ
(আঃ)- এর অনুসারীদের কাছে। হযরত মোল্লা ফুরী (রঃ) বলেছেন : ‘এতো
পরিকার যে, ‘আল্লাহকেবুল্লায়ি লায়ছা বা’দাহ নবীযুন’ কথাটি কোন সাহাবী
কিংবা পরবর্তী সময়ের কোন ব্যক্তি ব্যাখ্যা স্বরূপ বাড়িয়ে বলেছেন এবং
ইবনুল আরাবী বলেছেন যে, ‘আকেব’ তিনিই হয়ে থাকেন যিনি কোন ভাল
ব্যাপারে নিজের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হন।-(মিরকাত শরহে মিশকাত :
জিম, হে : পৃঃ ৩৭৪)

বাকী থাকলো ‘আখের’ শব্দ সম্বলিত হাদীস :

‘ইনি আখেরম্বল আবিয়ায়ে ওয়া আনতুম আখেরম্বল উমাম।’ অর্থাৎ আমি
আখেরী নবী এবং তোমরা আখেরী উম্মত। এই হাদীসটি একটি যয়ীফ বা
দুর্বল হাদীস।

এই হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্রধারার মধ্যে আছেন আবদুর
রহমান বিন মুহাম্মদ আল্লাহর আবিয়া যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাস্বল
বলেছেন যে, তিনি তদলীছ করতেন বা কথা বাড়িয়ে বর্ণনা করতেন। ইবনে
সায়দও বলেছেন, এই বর্ণনাকারী (আবদুর রহমান) বহু ভুল বর্ণনা করতেন।
এই হাদীসের অপর বর্ণনাকারী ইসমাইল বিন রাফার (আবু রাফা) বর্ণনাও
যয়ীফ বলে রায় দিয়েছেন ইমাম আহমদ বিন হাস্বল (রঃ)।

-(মিয়ানুল ইতেদাল : ১ম খন্ড : পৃঃ ১০৫)।

অবশ্য, মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে : রসুলুল্লাহ (সাঃ)
বলেছেন- ‘ফাইনি আখেরম্বল আবিয়া ওয়া আনা মাছজাদি আখেরম্বল
মাছাজেদ’- ‘আমি আখেরী নবী এবং আমার মসজিদ আখেরী মসজিদ।’ এখন
প্রশ্ন হচ্ছে- মসজিদুনববীর পর কি আর কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি? হয়েছে
বরং ইসলামের বাকী সব মসজিদই আহ্যরত (সাঃ)-এর মসজিদের পরেই
নির্মিত হয়েছে। কাজেই, আমার মসজিদই আখেরী মসজিদ- এই কথার
অন্তর্নিহিত তাত্পর্য হচ্ছে- আমার মসজিদের পরে এরূপ আর কোনও মসজিদ
নির্মিত হতে পারবে না, যার নির্মাণের উদ্দেশ্য আমার মসজিদের উদ্দেশ্যের

খেলাফ বা পরিপন্থী হবে। এখানে ‘আখেরী মসজিদ’ বলার যে তাৎপর্য সেই একই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে ‘আখেরী নবী’ কথাটির মধ্যেও। অর্থাৎ এর গৃহ্ণ অর্থ হচ্ছে— আমার পরে এমন কোন নবী হতে পারবে না, যে আমার শরীয়তের খেলাফ বা পরিপন্থী কিছু করবে কিংবা নতুন কিছু শরীয়ত প্রবর্তন করবে বা আমার পূর্ণ আনুগত্যের ভিতরে না থেকে বাইরে গিয়ে নবুওত্তরে দাবী করবে।

‘আখেরী’ শব্দটির অর্থ হয় চূড়ান্ত, তুলনাইন, অনন্য সাধারণ। যেমন, ইমাম জালালুদ্দিন সয়তী ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেছেন যে, ইবনে তাইমিয়া ছিলেন— আল্লামাতুল উলামায়ে, ওয়ারেসুল আবিয়ায়ে, আখেরুল মুজতাহেদীন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন, ‘আখেরী মুজতাহিদ।’ কিন্তু ইমাম তাইমিয়ার পরেও তো অনেক মুজতাহিদ হয়েছেন এবং হবেনও। কবি আল্লামা ইকবাল দাগকে বলেছেন— ‘আখেরী শায়ের’। যারা টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে তবলীগের বিশাল সমাবেশে প্রতি বছর সমিলিতভাবে একত্রে ‘আখেরী মুনাজাত’ করে আসছেন, তাঁদের কাছে এই ‘আখেরী’ শব্দটির তাৎপর্য বয়ান করাটা বোধ করি একটা বাহ্যিক্যমাত্র।

খাতামুন্নবীউন (৩)

এক্ষণে, আমরা বুজগানে উম্মতের মধ্য থেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কয়েকজন ওলী এবং আলেমের অভিমত পেশ করবো :

(১) আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, উম্মুল মুমেনীন হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) মুসলিম উম্মাহৰ প্রতি এই নির্দেশ দান করে গেছেন যে, তোমরা আহ্যরত (সাঃ)-কে খাতামুল আবিয়া বলবে কিন্তু একথা বলবে না যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই।

(দুঃ— তাকমেলা মাজমাউল বেহার, পৃঃ-৮৫;

তফসীর দুর্বে মনসুর, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪)

(২) হ্যরত মুহাউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রঃ) লিখেছেন : “রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবে যে নবুওয়ত রহিত হয়েছে তা শরীয়ত আনয়নকারী নবুওয়ত, নবুওয়তের মোকাম নয়। সুতরাং এমন কোন শরীয়ত আসবে না, যা আঁহ্যরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তকে রহিত করবে, কিংবা শরীয়তে কোন আদেশ বৃদ্ধি করবে। রসুল সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণী- ‘ইন্নার রেসালাতা ওয়ার্বুওয়াতা কাদ ইনকাতা’ত ফালা রসুলা বা’দী ওয়ালা নবীয়া’- এর অর্থ এটাই যে, ‘ভবিষ্যতে এমন কেউ নবী হতে পারবে না, যে আমার শরীয়ত বিরোধী হবে, বরং যখনই কোন নবী হবে সে আমার শরীয়তের অধীনে হবে।’- (ফতুহাতে মক্কীয়া : ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩)।

(৩) হ্যরত ‘বড়পীর’ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে তাঁর কালাম ও তাঁর রসুলের (সাঃ) কালাম- এর অর্থ গোপনে অবহিত করেন এবং এই মোকামের অধিকারী ব্যক্তিগণ হচ্ছেন-‘আস্বিয়াউল আউলিয়া’- (ওলীগণের মধ্য থেকে নবীগণ)।”

- (আল ইয়াকিতু ওয়া আল জওয়াহের : ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫)।

(৪) ‘আরিফে রব্বানী’ হ্যরত আব্দুল করীম আল ফিলী (রহঃ) বলেন :

‘প্রত্যেক নবী-এ-বেলায়েত হচ্ছেন ওলী-এ মুত্লাকা থেকে শ্রেষ্ঠ- আফজাল। এজন্যই বলা হয় যে, ওলীর চরমত্ব নবীর প্রথম স্তর।’- (ইসানুল কামিল, পৃঃ ৮৫)।

(৫) আরিফে রব্বানী (রহঃ) আরও বলেন :

‘তাঁর (সাঃ) পর তাশুরীয়ী (শরীয়তবাহী) নবুওয়ত বন্ধ হয়েছে এবং এই হিসাবেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম খাতামুনবীস্ন, কেননা তিনিই কেবল পূর্ণ শরীয়তসহ এসেছেন, এবং পূর্ণশরীয়তসহ আর কেহ আসেননি।’ (প্রাগুক্ত : ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮)

(৬) হ্যরত ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ)-এর বরাত দিয়ে আল্লামা আবু হাইয়ান (রহঃ) সুরা নিসার ‘ওয়ামাই ইউতিয়িল্লাহা ওয়ার রসুলা’- আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : রাগেব বলেছেন ‘এর অর্থ, আল্লাহ যাদেরকে

পুরস্কৃত করবেন তাদেরকে এই চারি শ্রেণীর মধ্যে মর্যাদায় এবং ছওয়াবে অন্তর্ভুক্ত করবেন— নবীকে নবীর সহিত, সিদ্ধিককে সিদ্ধিকের সহিত, শহীদকে শহীদের সহিত, এবং সালেহকে সালেহের সহিত’। (তফসীর বাহরাম মুহীত : ৩য় খণ্ড; পৃঃ ২৮৭)

(৭) প্রসিদ্ধ সুফী কবি হযরত মওলানা রূমী (রহঃ) লিখেছেন :

“খোদার পথে পুণ্য অর্জনের এমন সাধনা কর যেন উম্মতের মধ্যে নুবওয়তের অধিকারী হতে পার।”- (মস্নবী)

(৮) মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত আহমদ সরাহিন্দী (রহঃ) বলেছেন : “খাতামুর রসূল (সাঃ)-এর পর তাঁর আনুগত্য ও অনুবর্তিতায় এবং তাঁর উত্তরাধিকার সৃত্রে তাঁর অনুসারীগণের মধ্য থেকে কেউ নবুওয়তের কামালাত (গুণাবলী ও সাফল্য) লাভ করলে তা তাঁর (সাঃ) খত্মিয়াতের পরিপন্থী হবে না। সুতরাং তুমি এ ব্যাপারে সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।”-

- (মকতুব নং ৩০১ : ১য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩২);

(৯) হযরত সৈয়দ ওলীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) বলেছেন : তাঁর (আহ্যরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দ্বারা নবুওয়ত খতম হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে- তাঁর পর এমন কোন নবী আগমন করবেন না, যাঁকে আল্লাহ শরীয়ত দিয়ে লোকের প্রতি ‘মামুর’ (আদিষ্ট) করবেন।”-

- (তফসীমাতে ইলাহীয়া, পৃঃ ৫৩)।

(১০) ইমাম আব্দুল ওহহাব শা’রানী (রহঃ) বলেছেন : রসূল সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস- ‘আমার বাদ নবী বা রসূল নাই’- দ্বারা এটাই বোঝায় যে, তাঁর পরে শরীয়তবাহী কোন নবী নাই।’ - (আল ইউওয়াকিতু ওয়া আল জওয়াহের)।

(১১) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবী (রহঃ) লিখেছেন :

“সাধারণ লোকদের (আওয়াম) ধারণা আহ্যরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ‘খাতামুনবীঈন’ হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর যামানা সকল নবীর পরে এবং তিনি সকল নবীর শেষ- আখেরী নবী। কিন্তু, সুস্ক্রতত্ত্বজ্ঞানী

ব্যক্তিগণের নিকট এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, যামানার অগ্র-পশ্চাতের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত নেই। কাজেই, (তাঁর যুগ সকল নবীর পরে এবং তাঁকে সকল নবীর শেষ' বলা হলে) তাঁর প্রশংসা স্বরূপ 'ওয়ালাকির রসূলাল্লাহে ওয়া খাতামারবীঈন' বলা কীভাবে যথার্থ হতে পারে? (অথচ, এই কথাগুলি তো প্রশংসাসূচক)?"

তিনি খতমে নবুওয়াতের বিশদ ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

"বরং আমাদের নবী (সা:)—এর যামানার পরেও যদি কোন নবী বস্তুতঃ জন্মগ্রহণ করেন, তখাপি মুহাম্মদী খত্মিয়াতে কোন পার্থক্য ঘটবে না।" (তাহজিন্নাম : পৃঃ ২৮)

(১২) আল্লামা নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব লিখেছেন : 'আমার মৃত্যুর পর কোন ওহী নাই'- হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য, "আমার পরে নবী নাই" বর্ণিত হয়েছে। আহলে ইলম বা জ্ঞানী মানুষের নিকট এর অর্থ হচ্ছে- 'আমার পরে শরীয়ত রহিতকারী কোন নবী আসবেন না।' (একত্রোবুস্সায়া- পৃঃ ১৬)।

(দ্রঃ-খতমে নবুওয়াতঃ মওলানা কাজী মুহম্মদ নবীর লায়েলপুরী-রহঃ)

খাতামুন্নবীঈন (৪)

এ প্রসঙ্গে, আমরা আরও একবার কোরআন মজীদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই। আমরা পরিষ্কার দেখতে চাই যে, পবিত্র কোরআনে এমন কোন আয়াত আছে কি না, যেখানে আল্লাহতায়ালা ভবিষ্যতে নবী-রসূল প্রেরণের কথা ব্যক্ত করেছেন।

সুরা আরাফে আল্লাহ বলেছেন : -----

يَبْيَنِي أَدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَيْقَنٌ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ

فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَزُونَ ﴿٧﴾

“হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকটে তোমাদের মধ্য হতে রসূলগণ এসে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং সংশোধন করবে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য না কোন ভয় থাকবে এবং না তারা দুঃখিত হবে।” – (৭ : ৩৬)।

এই আয়াতে রসূলে পাক (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সর্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য তাদের মধ্য থেকে রসূলের আবির্ভাব ঘটবে। এই ঐশী ঘোষণায় এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে যে, আগমনকারী রসূল উম্মতি হবেন। বিধায়, তিনি ‘ইসলাহী’ হবেন ‘শরীয়তবাহী’ হবেন না।

কেউ কেউ বলতে চান যে, ‘বনী আদম’ বলতে এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে বোঝান হয়নি, বোঝান হয়েছে পূর্ববর্তী সব উম্মতকে। এখানে ‘বনী আদম’ থেকে এই উম্মতকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাদের যুক্তিটা অচল। কেননা, প্রথম, প্রশ্ন এই যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া কি ‘বনী আদম’ নয়? ত্বরীয়তঃ এই ঘোষণা আদম (আঃ)-এর মুখ দিয়ে দেওয়া হয়নি, হয়েছে রসূলে পাক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখ দিয়ে। ত্বরীয়তঃ ঠিক এই আয়াতের পূর্ববর্তী কতিপয় আয়াতেও ‘বনী আদম’ সর্বোধন করে অনেক আদেশ-নির্দেশ দান করা হয়েছে। সেই সব আদেশ-নির্দেশ কি তাহলে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য বাধ্যকর নয়? বরং সেগুলি তো উম্মতে মুহাম্মদীয়াকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সুতরাং, সত্য এটাই যে, আলোচ্য আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে ‘রসূলগণ’ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে।

সুরা আল হজ্জে আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

“আল্লাহ মনোনীত করে থাকেন রসূলগণকে ফিরিশতাগণের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতেও” (২২ : ৭৬)

এই আয়াতের ‘মনোনীত করা’ ক্রিয়ার কাল নিত্যবৃত্ত বর্তমান (Present Indefinite) অতএব, এই বাক্যে রসূল প্রেরণের বা মনোনীত করার যে ঘোষণা

দেওয়া আছে, তা সাধারণ ও সর্বকালীন। অতএব, নবী-রসূল প্রেরণের আল্লাহর যে চিরস্তন সুন্নত বা নিয়ম তা অচল বা মূলতবী হয়ে যায়নি। তাছাড়া, আল্লাহ স্থীয় সুন্নতের পরিবর্তন ঘটান না। (১৭ : ৭৮)।

(প্রসঙ্গ ক্রমে বলা প্রয়োজন যে, নবী ও রসূল কোন পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব নয়। বরং একই পবিত্র ব্যক্তিত্বের দুইটি আলাদা উপাধি। ‘নবী’ শব্দের অর্থ ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদবাহী এবং ‘রসূল’ অর্থ প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহর তরফ থেকে ভবিষ্যতের বেশুমার গুরুত্বপূর্ণ শুভ সংবাদবাহী (বশীর) এবং সতর্ককারী (নবীর) হিসেবে তিনি ‘নবী’ এবং আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির হেদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত জন্য ‘রসূল’। যেমন আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা ও প্রভু মুহাম্মদ (সা:) একদিকে রসূলুল্লাহ, অন্যদিকে ‘খাতামুনবীসিন’। হয়রত মুসা (আ:) এবং হয়রত ইসমাঈল (আ:) এবং আরও অনেকের জন্যই নবী ও রসূল উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে কোরআন করীমে। মুসা (আ:) শরীয়তবাহী নবী ছিলেন। কিন্তু, ইসমাঈল (আ:) ছিলেন শরীয়ত বিহীন নবী।)

সুরা ‘আল আহ্যাবে’ আল্লাহতায়ালা বলছেন :

“নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর রহমত নামেল করেছেন এবং তার ফিরিশতাগণও (তার জন্য রহমত কামনা করছে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত কামনা (দরুদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।” (৩৩ : ৫৭)

এই আয়াতে করীমায় এমন একটি কাজের কথা বলা আছে, যা স্বয়ং আল্লাহ করেন, ফেরেশ্তারা করেন এবং যা করার জন্য আদেশ দান করা হয়েছে মুমিনদেরকে, এবং সবাই জানেন মুবারক এই কাজটি হচ্ছে সাইয়েদনা ও মওলানা মুহাম্মদ (সা:)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা। আমি জানি না, এমন আর কি কাজ আছে যা আল্লাহতায়ালা নিজে করেন, ফেরেশ্তারা করেন এবং মুমিনরাও করেন আল্লাহর আদেশেই। অতএব, এই যে অসাধারণ গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ-দরুদ পাঠ-তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি আমরা একবার মনোনিবেশ করতে চাই।

আল্লাহর হকুম যেহেতু, সেহেতু আঁহয়রত (সা:)—এর প্রতি দরুদ পাঠ আমাদের জন্য বাধ্যকর। দরুদ শরীফের ফজিলত অস্ত্বীন। এই ফজিলতের কল্যাণে প্রেমিক বান্দার নাজাত হতে পারবে।

হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি যত বেশী দরুদ পাঠ করবে, সে কেয়ামতের দিনে রসূলে মকবুল (সা:)-এর তত কাছাকাছি থাকবে। আর যে দরুদ পাঠ করবে না, সে হাশরের ময়দানে প্রিয় নবী (সা:)-এর শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে, সে নাজাত বা পরিত্রাণ পাবে না।

আমরা নামাযে যে দরুদ শরীফ পাঠ করি তার অর্থ হলো : “ হে আমাদের আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ ও আশীষ বর্ষণ কর মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের অনুসারীদের প্রতি, যেমন তুমি অনুগ্রহ ও আশীষ বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত ও মহা মর্যাদাবান।

‘হে আল্লাহ তুমি বরকত বা কল্যাণ অবতীর্ণ কর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি, যেমন তুমি বরকত বা কল্যাণ অবতীর্ণ করেছিলে ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের অনুবর্তীগণের উপরে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত ও মহামর্যাদাবান।’

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,— এই দরুদ পাঠের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে আঁহয়রত (সা:) এবং তাঁর আহল ও উম্মতের জন্য কি প্রার্থনা করি? এবং তা আবার নির্দিষ্ট করে দেই এই বলে যে, ‘যেমন তুমি দান করেছিলে ইব্রাহিম ও তাঁর আহল ও উম্মতকে’ আল্লাহ ও ফেরেশ্তাদের দরুদ শরীফ পাঠের তৎপর্য আমরা না হয় না—ই বুঝলাম; কিন্তু আমরা আঁহয়রত (সা:)-এর জন্য, ইহকালের ও পরকালের কি আশীর্বাদ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি?

আঁহয়রত (সা:) হচ্ছেন খাতামুনবীস্টিন, সাইয়েদুল মুরসালীন,

তিনি আলা খুলুকিন আজীম, সিরাজুম মুনীরা,

তিনি সরওয়ারে কায়েনাত, শাহান-শাহ-এ দোজাহান,

তিনি রহমতুল্লিল আলামীন, রউফুর রহীম- ইত্যাদি;

তাহলে, আমরা কি চাই তাঁর জন্যে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তান-সন্ততির জন্যে? এবং যা ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে তুলনা করে নির্দিষ্ট করেও দিছি? কি সেই রহমত? কি সেই বরকত? আমরা যদি তা নির্দিষ্টভাবে না জানি, তাহলে আমাদের দরদ পাঠের প্রয়োজন কি? আক্ষাধূন্ধা প্রার্থনায় লাভ কি?

আমরা বিশ্বাস করি এবং জানি যে, দরদ শরীফের নির্দিষ্ট রহমত ও বরকত হচ্ছে ‘নবুওয়ত’। আল্লাহতু’লার এই খাস রহম ও বরকতে পরিপূর্ণ নবুওতের এক দীর্ঘ সিলসিলাই জারি ছিল ইব্রাহিম (আঃ) এবং তার আহল ও উপর্যুক্তের মধ্যে। স্বয়ং রসূল পাক (সাঃ)ও বলেছেন, ‘আমি ইব্রাহিমের দোয়ার ফল।’ ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন ‘আবুল আবিয়া’-নবীগণের পিতা। আমরা চাই, আমদের প্রিয় নবীও ‘আবুল আবিয়া’ হউন এবং দরদ শরীফে আমরা এই প্রার্থনাই করি। ফেরেশ্তাগণও এই প্রার্থনাই করেন। এবং আল্লাহর এই অঙ্গীকারই নিহিত আছে পিতৃত্বের প্রশ়ে অবতীর্ণ সুরা আল্ কাওসারে’। বলা বাহ্য, ‘খাতামারবীঙ্গন’ - আয়াতের শানেন্যুলও ‘পিতৃত্ব’।

(আল্লাহহ্য সাল্লু আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলে

মুহাম্মাদিন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম। ইন্নাকা হামীদুম মজীদ।)

বক্তৃতঃ, “কুলু বারাকাতিম মিম মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম” - ইলহাম : মসীহ মাওউদ (আঃ)

“সমস্ত আশীষ ও কল্যাণ মুহাম্মদ (সাঃ) থেকেই।”

সুরা ফাতেহার অন্য এক নাম উম্মুল কোরআন- কোরআনের জননী। সাত আয়াতের ছেট এই সুরাটি- সাত সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশির বিশাল বিস্তার ও অগাধ গভীরতার চাইতেও অন্তর্বীন ও অতলান্ত। এই সুরা সকল আশীষ ও কল্যাণের, নেয়ামতের ও বরকতের সম্পূর্ণ ও সমগ্র প্রার্থনা,- মহোন্তর ও সুন্দরতর প্রার্থনা। এই সুরাতে আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে একটি দোয়া করতে শিখিয়েছেন:

إِهْدِنَا الْقِرَاطُ السُّتْقِيْمُ ⑤ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا مُهْمَةً

“তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পূরক্ষ্ট করেছ অর্থাৎ এন্তাম দান করেছ। (১ : ৬, ৭)

এই এন্তাম কি?—

পবিত্র কোরআন যেহেতু নিজেই নিজের উৎকৃষ্ট তফসীর সেহেতু এর উত্তর কোরআনেই আছে। তাই আমরা দেখতে পাই আল্লাহু পাক সুরা নেছায় বলেছেনঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ
وَالْقَدِيرِيْقِيْنَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِيْحِيْنَ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

“এবং যারা আল্লাহু এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ পূরক্ষার দান করেছেন অর্থাৎ নবীগণ সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং এরাই সঙ্গী হিসেবে উল্লম্ব।” (৪ : ৭০)

সুতরাং সুরা ফাতেহার সেই প্রার্থিত পূরক্ষারসমূহ হচ্ছে—যা দান করা হয়েছে নবীগণকে, যা দান করা হয়েছে সিদ্দীকগণকে, যা দান করা হয়েছে শহীদগণকে এবং যা দান করা হয়েছে সৎ বান্দাগণকে। এই পূরক্ষারসমূহের জন্য আমরা প্রার্থনা করি,—এই প্রার্থনা আমরা নামাজের মধ্যে করি, এই প্রার্থনা করা বাধ্যকর, অন্যথায় নামাজই হবে না। আল্লাহ দোয়া শিখিয়েছেন এবং সেই দোয়া করা বাধ্যকর করেছেন এইজন্যে যে, তিনি তাঁর অশেষ কৃপায় এই সকল বিশেষ বিশেষ এন্তাম আমাদেরকে দান করবেন। এই দোয়া আমরা নিজের জন্যে করি অপরের জন্য করি, সবার জন্য করি। এবং আমরা এই প্রার্থনা এই মনোভাব নিয়ে করি না যে, হে আল্লাহু রয়ুল আলামিন, রহমানুর রহীম। তুমি আমাদেরকে সাধুতা বা সালেহিয়াত, শাহাদৎ এবং সিদ্দীকিয়াৎ তো দান করো, কিন্তু তুমি যেন আমাদের কাউকেই নবুওয়াত দান

না করো। বরং সত্য এটাই যে, আমরা যখন এন্টাম প্রাণির আশায় ও সাধনায় অবিজ্ঞপ্তির প্রার্থনা করে যাই তখন নবুও'তের জন্যেও প্রার্থনা করি। তা কেউ বুঝে করি, কেউ বা না বুঝেও করি। সুতরাং খোদাতায়ালা যখন এই উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে অন্য সব এন্টামের সঙ্গে নবুও'তের জন্যেও দোয়া করতে শিখিয়েছেন তখন সেই দোয়া করলে এই উম্মতের মধ্য থেকে যেমন অনেকেই সালেহ, শহীদ ও সিদ্দীক হবেন, তেমনি কেউ নবীও হবেন। অন্য কথায়, নূরে মুহাম্মদীয়ার বেইত্তেহা ফয়জ ও বারাকাতে-অন্তহীন আধ্যাত্মিক আশীষ ও কল্যাণসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই মহত্তী উম্মতের মধ্য থেকে যেমন কেউ কেউ 'উম্মতী-সালেহ' হবেন, 'উম্মতী-শহীদ' হবেন, 'উম্মতী-সিদ্দীক' হবেন, তেমনি কেউ 'উম্মতী নবী'ও হবেন। ফিরেত বা মানব-প্রকৃতির শুভ ও সুন্দর বিকাশের জন্য এটাই স্বাভাবিক এবং এজন্যই প্রার্থনা শিখিয়েছেন আল্লাহ সূরা ফাতেহায়। বলা বাহ্য্য, এখানেই নিহিত উম্মতে মুহাম্মদীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব, এজন্যই এই উম্মত সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত-খায়রা উম্মত। অন্যথায় পূর্ববর্তী কোন উম্মতের উর্ধ্বে এই উম্মতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব প্রমাণিত হবে না। কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতও সিদ্দীকিয়াতের এন্টাম পর্যন্ত লাভ করেছিল। যেমন কোরআন করীমে বলা আছেঃ

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَنُورٌ هُمْ

"যারা আল্লাহর এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক এবং শহীদগণের পর্যায়ভূক্ত। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর।---" (৫৭ : ২০)

এখন, এই মুহাম্মদী উম্মতও যদি শুধু শাহাদাৎ ও সিদ্দীকিয়াতের পুরস্কার পর্যন্তই প্রাপ্ত হন, তার অধিক ও উর্ধ্বের পুরস্কারপ্রাপ্ত না হন, তাহলে তো মুহাম্মদী উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীটা টিকে না, বরং তা একটা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিন্তু, তা হতে পারে না। তাই, প্রকৃত বাস্তবতা

এটাই যে, মুহাম্মদী উপর্যুক্ত সিদ্ধীকিয়াতের অধিক ও উর্ধ্বের যে পূরক্ষার নবুওয়ত, সেই অনন্য পূরক্ষারেও ভূষিত হবে, এবং হয়েছেও আল্লাহর ফজলে। যে বুঝে তার বুক আনন্দে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আল্লাহমদুলিল্লাহ্ আলা যালেক--।

অপরদিক থেকে বললেও বলতে হবে যে, আইয়রত (সাঃ)-এর পবিত্র আশীষভরা পূর্ণ আদর্শ, কোরআন করীমের কল্যাণময় পূর্ণ শিক্ষা-পূর্ণ মানব তৈরী করতে সক্ষম; এবং এটা জানা কথা যে, এইরূপ পূর্ণ মানব বা 'ইনসানে কামেল' এর অন্য নাম 'নবী'। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, মুহাম্মদী আদর্শ এবং কোরআনী শিক্ষা নবী অর্থাৎ পূর্ণ মানব তৈরী করতে সক্ষম নয়, তাহলে প্রকারান্তরে এই অসত্য কথাটাই ব্যক্ত করা হবে যে, মুহাম্মদী আদর্শ ও কোরআনী শিক্ষা পূর্ণ নয়, কামেল নয়। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি যে, এবং আমাদের এই জানাটায় কোনও ফাঁকও নেই যে, আইয়রত (সাঃ)-এর আদর্শ কামেল আদর্শ, কোরআনী শিক্ষা কামেল শিক্ষাঃ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম,—কামেল দীন। অতএব, এই কামেল দীন কামেল মানব বা নবীউল্লাহ্ তৈরী করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যিনি এই সত্য মানেন না, এই তত্ত্ব উপলক্ষ্য করতে চাহেন না, তাঁর পক্ষে ইসলামকে কামেল দীন বলা নির্থক।

এই প্রসঙ্গে মাত্র আর একটা বিষয়ের প্রতি আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে হয়রত রসূলে পাক (সাঃ)-এর পিতৃত্ব। আপনারা জানেন,-

(ক) অস্থীকারকারীদের পক্ষ থেকে আপত্তি উথাপিত হলোঃ- 'মুহাম্মদ অপুত্রক'

আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ 'নিশ্চয়ই তোমার যে শক্ত সে-ই অপুত্রক'।

-(সুরা কাওসার)

(খ) আপত্তি উথাপিত হলোঃ 'মুহাম্মদ পুত্রবধুকে নেকাহ করেছে।'

আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ

(১) 'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়'-

(২) 'কিন্তু—সে আল্লাহর রসূল এবং খাতামানাবীউন'—(সুরা আহযাব)

লক্ষ্য করুন,—

শক্রুম্বা বলছে মুহাম্মদ অপুত্রক'

আল্লাহ বলছেন—শক্রুই অপুত্রক।' কিন্তু আবার-

আল্লাহ বলছেন—'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যেকার কোনও পুরুষেরই পিতা নয়।'---

আপাতৎ দৃষ্টিতে মনে হবে, শক্রুদের আপত্তি এবং আল্লাহর উভয়ের কোনও বিরোধ নেই, বরং মনে হবে—আল্লাহর কথাই পরম্পর বিরোধী। কাজেই, প্রশ্ন উঠবে,—তাহলে কি আল্লাহ কাফেরদের আপত্তিটাই সমর্থন করেছেন? এই প্রশ্নটার সমাধান নিহিত আছে—

(খ) অংশের দ্বিতীয় কথা দুটির মধ্যে। এই কথা দুটির তাৎপর্য হচ্ছেঃ

(১) মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল—অর্থাৎ তিনি রসূলুল্লাহ' হওয়ার বদৌলতে তাঁর উন্মত্তের পিতা, অতএব তিনি অপুত্রক নন। এবং

(২) এই আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের মর্যাদায় তিনি এত বড় যে, তিনি 'খাতামানাবীউন'—'নবীগণেরও পিতা'। অতএব তিনি কোনমতেই অপুত্রক নন। প্রসঙ্গ বা শান-এ-নয়ুল যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই পিতৃত্ব, সেহেতু এই অর্থ বাদ দিয়ে আর যত অর্থই করা হোক না কেন, শক্রুদের আপত্তির সঠিক উত্তর হবেনা।

তাছাড়া, শক্রুই যে অপুত্রক, সে কথা বোধকরি ব্যাখ্যা করে বলার কোন প্রয়োজন নেই, না আধ্যাত্মিকভাবে, না ঐতিহাসিকভাবে। মনে রাখতে হবে যে, আধ্যাত্মিক অনুসারী না হলে নবীর দৈহিক বা জাত পুত্রকেও নবীপুত্রত্বের মর্যাদা দান করা হয় না, যেমন হয়নি নূহ (আঃ)—এর এক পুত্রকে। এবং এ

কারণেই, 'তোমাদের (শক্র এবং অস্ত্রীকারকারীদের) পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা আহ্যরত (সাঃ) সেদিনও ছিলেন না, আজও নন, ভবিষ্যতেও হবেন না। আর তাই, এক্ষেত্রে 'খাতামানাবীন' বা 'নবীগণের পিতা' হওয়ার যে আধ্যাত্মিক অনন্য সমান ও অতুল মর্যাদা আহ্যরত (সাঃ)কে দান করেছেন আল্লাহ, সেই সমান ও মর্যাদার অস্ত্রীকারকারীদেরকে সেদিন ঐ 'বাণী চিরস্তনীতে যেমন বলা হয়েছিল, তেমনি আজও বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতেও বলা হবে—

'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়।'

مَّا كَانَ مُهَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ قَنْ رِجَالُكُمْ

যে মৌলবী-মৌলানারা দেশের রাজা-বাদশা, এমনকি রাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত 'যিন্নুল্লাহ' বলতে গদগদ হন, তাঁরা কেন যে এক ব্যক্তিকে 'যিন্নুল্লাহ' মানতে বললেই তড়ে উঠেন, কে জানে।

জামাতে আহমদীয়ার বিকল্পে কুফুরীর ফতোয়া দান স্পর্শে কোন সুস্থ বুদ্ধির ভদ্রলোক যখন এই প্রশ্ন তোলেন যে, আহমদীয়া তো কলেমা পাঠ করে, নামাজ পড়ে, রোয়া রাখে, যাকাত দেয়, হজ্ঞ করে, এক কথায়, তারা তো ইসলামী শরীয়ত পুরাপুরি পালন করে, তখন তাদেরকে কী করে অমুসলমান বা কাফির বলা যায়? এই প্রশ্টোর জবাবে তাদের আলেমরা বলেন, 'মুসায়লামা কায়্যাব ও শরীয়তের হকুম আহকাম পালন করতো; তবু তাকে কাফের ও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এ জন্যই যে, সে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছিল। এবং একইভাবে মিয়া গোলাম আহমদও যেহেতু নবুওয়তের দাবী করেছিল, সেহেতু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীরাও কাফের মুরতাদ, অমুসলমান।' কিন্তু—

আমরা জানি এবং ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন যে, মুসায়লামা লোকটা ছিল অন্ধকারের সন্তান। সে নবুওয়তের বিষয়টাই বুঝতো না। মনে করতো যে, নবুওয়ত কোন ইলাহী বা ঐশ্বী বিষয় নয়; লৌকিক বিষয়। তাই,

সে তার মনমত ও সুবিধামত শরীয়ত তৈরী করে নিয়েছিল। সে তার অনুচরদের জন্য নামাজের ওয়াক্ত পাঁচ থেকে, ফজর ও এশা বাদ দিয়ে তিনি করেছিল। সে কলেমা থেকে হ্যরত রসূলে পাক (সা:)—এর নাম বাদ দিয়ে, তার নিজের নাপাক নামটা সংযুক্ত করেছিল। সে যাকাত প্রথা বিলোপ করে দিয়েছিল। সে তার মত মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার একটা খবীছ স্ত্রী লোকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। স্ত্রীলোকটাকে সে নেকাহ করেছিল। সে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। মুসায়লামা কায়্যাবের ঐ সব মিথ্যাচারিতা, ঐ সব ক্রিয়াকলাপ, বাগাওত এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। তথাপি, এসব জেনে শুনেও কতক মুফতী সাহেবান যে মুসায়লামা কায়্যাবের সাথে হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ:)—এর তুলনা করেছেন, তার কারণ হচ্ছে, তাদের এক মিথ্যাকে তাদের আরেক মিথ্যা দিয়ে ঢাকার অপকৌশল অবলম্বন করা; তার কারণ হচ্ছে,— পার্থিব স্বার্থকে ধর্মীয় স্বার্থের উপরে প্রাধান্য দান করা; তার কারণ হচ্ছে,— অঙ্গজিদ ও বিদ্বেষকে বজায় রাখার জন্য সত্যকে মিথ্যা বলে এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা। প্রবাদ আছে, এক মিথ্যা শত মিথ্যাকে টেনে আনে।

আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে আমরা জেনেছি এবং বিশ্বাস করেছি যে, হ্যরত মির্যা সাহেব তো হ্যরত রসূলে আকরাম (সা:)—এর এক উচ্চতি, তাঁর (সা:) শরীয়তের পূর্ণতম অনুবর্তিতাকারী, তাঁর পবিত্র প্রেমে আপন স্বত্ত্ব বিলোপকারী, তাঁর রঙে রঙিন হয়ে তাঁর নবুও'তের প্রতিবিষ্কৃতে নবুও'তের দাবীকারী। লৌহখণ্ড যেমন জুলন্ত আগুনের ভেতরে থেকে আগুনের মত লাল হয়ে ওঠে এবং আগুনের গুণে গুণাবিত হয়; মির্যা সাহেবও তেমনি নবুও'তে মুহাম্মদীয়ার গভীর অভ্যন্তরে নিমগ্ন থেকে সেই নবুও'তের রঙে রঙিন হয়ে সেই নবুও'তের গুণে গুণাবিত। এ রঙ তাঁর নিজের নয়, এ গুণও তাঁর নিজের নয়,— এর সব কিছুই নবুওতে মুহাম্মদীর।

তিনি তো এক পূর্ণচন্দ্র মাত্র এবং আসল কিরণদাতা সূর্য তো মুহাম্মদ (সা:)। পূর্ণিমার চাঁদের যে কিরণ, সে তো সূর্যেরই প্রতিফলন। চাঁদের আলোও

অবশ্যই আলো, কিন্তু তবু তা সূর্যেরই প্রতিফলিত আলো। তাই, মির্যা সাহেবের নুবও'ত আসলে মুহাম্মদী নবুওতই, তা মুহাম্মদী নবুও'তেরই পুনঃপ্রকাশ। মুহাম্মদী নবুওত যে চিরজীবন্ত, চির কল্যাণবর্ষী, তাঁর কল্যাণসমূহ যে চিরস্তন ও চিরকালীন, তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব যে অব্যয় ও অক্ষয়, তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি যে অসীম ও অসাধারণ তারই প্রমাণ স্বরূপে মির্যা সাহেবের অস্তিত্বে তাঁর (সাঃ) পুনর্বিকাশ; এবং সুরা জুমুয়ার 'ওয়া আখারিনা মেনহম লামা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াতে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ ঝরপায়ণ। কত মহান, কত গৌরবময় সেই পবিত্র নবী (সাঃ) যাঁর উচ্চতম আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও কালজয়ী রূহানী শক্তির পুনঃপ্রকাশ তের শ' বছর পরে পুনরায় আকাশ ও পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলেছে এবং কত মহান ও গৌরবান্বিত সেই 'উশ্মতি নবী' যাঁর মাধ্যমে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে তাঁর (সাঃ) কামেল নবুও'য়ত। মুহাম্মদী নবুওয়তের এই পুনর্বিকাশকে তারাও, খোদার ফজলে, সনাত্ত করতে পারে যাদের হৃদয়ে নূরে মুহাম্মদীর কগামাত্র কিরণের সম্পাত ঘটে।

দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ

আখেরী যামানায় ভয়ৎকর এক ফির্না সৃষ্টি হওয়ার কথা, এই ফির্নারই আরেক নাম দাজ্জাল। আভিধানিক অর্থে দাজ্জাল দ্বারা বুঝায় প্রধানতঃ মহা মিথ্যাবাদীর দল, যারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে তুলে ধরে। আধুনিক কালের কুটনীতি বা ডিপ্লোমেসীও এর মধ্যে পড়ে। দাজ্জাল, তার গাধা বা বাহন এবং সেই সঙ্গে ইয়াজুজ ও মাজুজেরও বর্ণনা দান করেছেন হ্যরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)। এগুলিকে স্বপ্নে বা কাশ্ফে (দিব্য-দৃষ্টিতে) দেখেছিলেন তিনি। কাজেই প্রদত্ত সেই বর্ণনাগুলির তাবির বা ব্যাখ্যা করে বুঝতে হবে।

হ্যরত রসুলে পাক (সাঃ) দাজ্জালের পরিচয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতের প্রতি। এই

আয়াতগুলির মধ্যে আছে যে, কোরআন অবজীর্ণ করা হয়েছে তাদেরকেও
সতর্ক করে দেওয়ার জন্য যারা বলে—

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا لَهُ وَلَدٌ أُنْتَ ۝ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۝ وَلَا
لِأَبَائِيهِمْ كَبَرْتُ عَلَيْهِمْ تَخْرُجُ مِنْ آفَوَاهِهِمْ إِنْ تَقُولُونَ إِلَّا
كَذَّابًا ۝

“এবং যেন ইহা এই সকল লোককে সতর্ক করে, যারা বলে, ‘আল্লাহ এক
পুত্র গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের
পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে
নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে। (১৮ : ৫, ৬)

এই মিথ্যাবাদীরাই হচ্ছে দাঙ্গাল। এদেরকে হজুর (সা:) বলেছেন
'দাঙ্গালুনা কাশ্যাবুনা'- 'দাঙ্গালগণ, মিথ্যাবাদীগণ'। বলা নিষ্পয়োজন যে,
প্রচলিত খৃষ্টধর্মের পাদ্বীরাই এই জঘন্য মিথ্যাটা দুনিয়ার প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রচার
করে বেড়ায যে, যীশু খোদার পুত্র, এক পুত্র-খোদা।' এই পাদ্বীদের প্রবর্তিত
ত্রিত্ববাদের অপর নাম দাঙ্গালিয়াত। এই ত্রিত্ববাদিতার মূল শিক্ষা হলো :
ঈশ্বর-পুত্র যীশু দ্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দ্রুশে বিন্দু অবস্থায়
তাঁর যে রক্তপাত হয়েছে— সেই রক্তেই পূর্বাপর সকল মানুষের পাপ মোচন
হবে; পরকালে তাদের কোন বিচারাই হবে না, তারা যীশুর রক্তক্ষরণের উপরে
বিশ্বাস করলেই পরিত্রাণ বা নাজাত পেয়ে যাবে। এই যে মানব-বিবেক
বিরোধী, পবিত্রতা বিরোধী, সত্য ও ন্যায় বিরোধী এবং খোদা-বিরোধী
বিশ্বাসটা,— এটাই হচ্ছে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম। যার উৎপত্তি ঘটেছে যীশুর দ্রুশে
মৃত্যুবরণ করার মিথ্যাটাকে কেন্দ্র করে। এই মিথ্যা দুর্শীয়-বিশ্বাসটাকে
সমাধিস্থ করেছেন হ্যরত মির্ধা গোলাম আহমদ (আ:) এই সত্য প্রতিষ্ঠিত
করে যে, দ্রুশে বিন্দু হয়ে প্রাণত্যাগ করেননি, যীশু প্রাণ ত্যাগ করেছেন
স্বাভাবিকভাবে পরিণত বয়সে, এবং তার মরদেহ সমাধিস্থ আছে ভূর্বৰ্গ
কাশ্মীরের শীনগরের খানইয়ার মহল্লায়। বলা নিষ্পয়োজন যে, যীশুর স্বাভাবিক

মৃত্যুই বস্তুতঃ, প্রচলিত খৃষ্টধর্মেরও স্বাভাবিক মৃত্যু। এটাই হাদীসে উল্লেখিত ‘ক্রুশভঙ্গ’ এবং ‘দাজ্জাল বধ’ করা। ‘ক্রুশভঙ্গ’র বিস্তারিত আলোচনা আমরা করে এসেছি।

এই দাজ্জালিয়াতের অপর নাম খৃষ্টিয়ানিটি। এবং খৃষ্টান জাতিশুলির রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির নাম হচ্ছে ইয়াজুজ ও মাজুজ। অন্য কথায়, আধুনিক ইউরোপের খৃষ্টান জাতিশুলি হচ্ছে ইয়াজুজ ও মাজুজ। নাস্তিকতা ও কম্যুনিজম এই দাজ্জালিয়াতের গভর্নেন্স নিয়েছে।

প্রতিশ্রূত মসীহ ও মাহদী হয়রত মির্যা সাহেব (আঃ) লিখেছেন : “খোদা না খাস্তা, যদি সত্য সত্যই, কুরআন কর্মে লিখা থাকতো যে, খোদাতায়ালার সেই চিরতন নিয়ম ও সুরতের বরখেলাকে অর্থাৎ সমস্ত বনী-আদমের জন্য যে নিয়ম জারি আছে তার খেলাকে মসীহকে জিন্দা আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত জিন্দাই রাখা হবে, তাহলে খৃষ্টানদের পক্ষে বিভ্রান্ত করবার আরও বড় বড় উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হত। কিন্তু, খুব কাজের কাজ হয়েছে যে, খৃষ্টানদের সেই খোদা মারা গেছে; এবং এই যে হামলা তা কোনও বল্লমের হামলার চাইতে কম ছিল না, যা এই অধম করেছে। খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে মসীহ ইবনে মরিয়মের মত হয়ে ঐ সকল দজ্জাল চরিত্রের লোকদের উপরে যাদেরকে পাবিত্র বস্তু দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তার সাথে অপবিত্র বস্তু মেশায়ে ফেলেছে এবং সেই কাজই করেছে যা দজ্জালের করণীয়।

-- এই যামানায় পাদ্বীদের মত আর কোনও দজ্জাল আজও পর্যন্ত পয়দা হয়নি এবং কেয়ামাত পর্যন্ত পয়দা হবে না।”

(এজালা আওহাম, পৃঃ ১৬১)

“আমি এটাও প্রমাণিত করেছি যে, ইয়াজুজ মাজুজের যামানাতেই মসীহ মওটদের আবির্ভাব হওয়া জরুরী। যেহেতু আগুনকেই ‘আজীজ’ বলা হয়, যা থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দের উৎপত্তি সেহেতু, যে ভাবে আল্লাহ আমাকে বুঝায়েছেন, ইয়াজুজ মাজুজ হলো সেই সব জাতি যারা পৃথিবীতে আগুন দ্বারা কাজ করতেই উন্নাদ..... সুতরাং এরা হচ্ছে ইউরোপের জাতিশুলি

..... পূর্ববর্তী কেতাবগুলিতেও ইউরোপের লোকদেরকেই ইয়াজুজ মাজুজ বলা হয়েছে, এমনকি মঙ্গোর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে, যা প্রাচীনকাল থেকেই রাশিয়ার রাজধানী। আর, এটা নির্দিষ্ট ছিল যে, প্রতিশ্রূত মসীহ ইয়াজুজ মাজুজের যামানাতেই জাহির হবেন।”

হাদীসসমূহে দৃশ্যত : একটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়, মসীহ মণ্ডের আবির্ভাবের সময়ে একদিকে তো এই কথা বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ মাজুজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং অপর দিকে এটাও বলা হয়েছে যে, তখন সারা পৃথিবীতে খৃষ্টান জাতির জয় জয়কার হবে। আবার অন্যান্য হাদীসে এ কথাও বলা আছে যে, মসীহ মণ্ডের আবির্ভাবের সময়ে সারা দুনিয়াতে দাঙ্গালের জয় জয়কার হবে এবং একমাত্র মঙ্গা মুয়াজ্জামা বাদে সারা পৃথিবীকেই দাঙ্গাল ঘিরে ফেলবে। এখন, কোনও মৌলবী কি বলে দিবেন যে, এই যে বৈপরীত্য, তা দূর করা যাবে কিভাবে? যদি দাঙ্গাল গোটা দুনিয়াটাকেই ঘিরে রাখে, তাহলে খৃষ্টান সাম্রাজ্য থাকবে কোথায়? তাছাড়া, ইয়াজুজ মাজুজ, যাদের ব্যাপক রাজত্বের ঘৰ দিয়েছে কুরআন শরীফ, তারাই বা থাকবে কোথায়?

.....ঘটনাই তো প্রমাণ করেছে যে, ইয়াজুজ মাজুজ ও দাঙ্গালের যে বৈশিষ্ট্য তা ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যেই বিদ্যমান।কেননা, ইয়াজুজ মাজুজের বর্ণনায় হাদীসে একথাও বলা বলা আছে যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবেলার শক্তি কারও হবে না, এবং মসীহ মণ্ডেও শুধু দোয়ার দ্বারাই কার্য সমাধা করবেন। তাদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন শরীফেও পরিকল্পনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে :

‘ওয়া হম মিন কুল্লে হাদাবেন ইয়ানসেলুন।’ এবং দাঙ্গালসম্পর্কে হাদীসে এই বয়ান এসেছে যে, সে ‘দাঙ্গাল’ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য সম্পাদন করবে, ধর্মের আড়ালে দুনিয়ার বুকে ফিৎনা ছড়াবে। আর কুরআন শরীফে তো এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলা হয়েছে খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে।

এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতিপন্থ হয় যে, এই তিনি (দাঙ্গাল, ইয়াজুজ- মাজুজ, খৃষ্টান পাদ্রী) একই। এ কারণেই সুরা ফাতেহায় চিরন্তনরূপে

এই দোয়াই শেখানো হয়েছে যে, তোমরা খৃষ্টানদের ফেণ্ডা থেকে পানাহ বা আশ্রয় চাও, এ কথা বলা হয়নি যে, দাঙ্জাল থেকে পানাহ চাও।”

(চশমায়ে মারেফাত - পৃঃ ৭৭-৭৯, হাশিয়া)

“দাঙ্জাল যদি আলাদা ফাসাদ সৃষ্টিকারী কেউ হতো তাহলে তো কুরআন শরীফে খোদাতায়ালা ‘ওলাজ্জেয়াল্লীন’ না বলে ‘ওলাদ্দাঙ্জাল’ বলতেন।

(হকীকাতুল ওহী, পৃঃ ৩৮)

খৃষ্টধর্ম প্রচারকারী এই দাঙ্জালদের কপালে লিখা আছে কাফ, ফে, রে- অন্য কথায় কাফের,- যা অশিক্ষিত মুমিনেও পড়তে পারে, কিন্তু মুমিন না হলে শিক্ষিতেও পড়তে পারবে না। এর ডানচক্ষু বা আধ্যাত্মিক চক্ষু কানা বা টেরো। এর সাথে ঝটি বা খাদ্যদ্রব্যের পাহাড় থাকবে; পাদ্বীরা তো ঝটি রোজগারের লালসা দিয়েই ধর্মান্তরিত করছে লোকদেরকে। এর সাথে বেহেশ্ত ও দোজখ থাকবে,- এদের আনুগত্য করলে বৈষয়িক ও সামরিক সাহায্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়, না করলে (ফেলিস্তিনে বা ভিয়েতনামে বা ইরাকে) জাহানাম সৃষ্টি করা হয়। মক্কা ও মদীনা ছাড়া সর্বত্রই দাঙ্জালের বিচরণ করার কথা, কিন্তু, এখন তো তাদের লোকেরা কাছাকাছি পৌছে গেছে।

এই দাঙ্জালের বাহন বা গাধার খোরাক হবে আগুন ও পানি,

তার কপালে থাকবে চাঁদ

মাথার উপরে থাকবে ধৌয়ার-মেঘের কুণ্ডলী,

এক কান থেকে আরেক কানের (শ্বরণযন্ত্র) দূরত্ব হবে ৭০ হাত,

চীৎকার করলে বহুদূর থেকে শোনা যাবে,

সাগরের মধ্যে তার মাত্র পায়ের খুরা ভিজবে,

তার পেটের মধ্যে বাতি জ্বলবে,

তার পেটের মধ্যে মানুষেরা ঢুকবে এবং বের হবে-----ইত্যাদি।

এখন যে কোন বুদ্ধিমান বালকেই বলতে পারবে যে, এটা তো টেন ও জাহাজের বর্ণনা। এবং এই গাধার পেটে চড়েই খৃষ্টান পাদ্বীরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মানুষের ইমান লুট করছে।

মুসলিম শরীফে—নয়লে মসীহ, দাঙ্গাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত
নওয়াস ইবনে সামান বর্ণিত, এক দীর্ঘ হাদীসে আছে—

হযরত রসুলে আকরাম (সা:) বলেছেন :

‘আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রূত মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ:)—এর নিকটে ওহী
করে বলবেন,— একটা দল বের হয়েছে, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা
কারো নেই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদেরকে সিনাই পাহাড়ে নিয়ে যাও।
তখন আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব ঘটবেন.....’

‘আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজের স্কন্দে এক প্রকার কীট (রোগের জীবাণু)
সৃষ্টি করবেন, ফলে তাদের সকলেই এক দিনেই মারা
যাবে.....’

‘অতঃপর নবীউল্লাহ ঈসা ইবনে মরিয়ম পাহাড় থেকে অবতরণ করবেন
তাঁর সাহায্যণসহ.....’ ইত্যাদি।

এই হাদীস থেকে একদিকে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিশ্রূত মসীহ (আ:)
এর উপরে ওহী হবে এবং তিনি আল্লাহর নবী হবেন। অপরদিকে,— তিনি
ইয়াজুজ ও মাজুজের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। আল্লাহর প্রত্যক্ষ আয়াবে ধ্বংস
হবে ইয়াজুজ ও মাজুজের দলবল। কাজেই, প্রতিশ্রূত মসীহ ও মাহ্নী (আ:)
এসে যুদ্ধ করে ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করবেন, প্রচলিত এই ধারণাটা
বানোয়াট। বরং, তিনি দীর্ঘকাল ধরে ত্রমাগতভাবে দাঙ্গালী ফিৎনা বা
ধর্মবিশ্বাস তথা দাঙ্গালী রেনেসাঁ ও সত্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবেন
যুক্তি-প্রমাণ এবং ঐশী-নির্দশন প্রকাশের মাধ্যমে। দাঙ্গালী ফিৎনা যেমন
দীর্ঘকাল যাবৎ মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিনাশ করে চলেছে নানাভাবে এবং
সর্বোপরি আল্লাহর একত্ব বা তৌহিদ এবং রসুল পাক (সা:)—এর সত্যতাকে
নস্যাং করার জন্য ইতর ও অপবিত্র কর্মকাণ্ডে লিখ রয়েছে; সেই ভয়ৎকর
ফিৎনাকে পৃথিবী থেকে মিটায়ে ফেলার জন্য মসীহ ও মাহ্নী (আ:)-কেও
তেমনি দীর্ঘকাল ধরে অবিচল আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বব্যাপী সত্য প্রতিষ্ঠার সেই মহান ও পবিত্র আধ্যাত্মিক সংগ্রামই চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ-মাহদী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত।

আলোচ্য এই হাদীসে আরও আছে-

(১) হ্যরত মসীহ ইবনে মরিয়ম (আঃ) আবির্ত্ত হবেন- শেষ মিনারার কাছে;

(২) তিনি হলুদ রং এর চাদর পরিহিত থাকবেন;

(৩) তিনি দুইজন ফেরেশতার ডানায় ভর করে নামবেন;

(৪) তিনি মাথা নীচু করলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল জগবিন্দু টপ টপ করে ঝরতে থাকবে;

(৫) তাঁর নিখাসে কাফের মারা যাবে;..... ইত্যাদি।

এই বর্ণনা স্পষ্টতই কাশ্ফের বা স্বপ্নের। এ সবের ব্যাখ্যা বা তাবির না করে, হ্বহ আক্ষরিক মনে করার দরক্ষণই সৃষ্টি হয়েছে যতসব জটিলতা ও বিদ্রোহিতা আসলে,

(১) সাদা মিনারার কাছে নাযিল হওয়ার অর্থ পরিষ্কার যুক্তি-প্রমাণ সহ উপস্থিত হওয়া বা আগমন করা;

(২) হলুদ রঙের চাদর পরিহিত- অর্থ- অসুস্থ থাকা;

(৩) ফেরেশতার ডানায় বা কাঁধে ভর করে নামার অর্থ- আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যসহ আগমন করা;

(৪) মাথা নীচু করলে টপ টপ করে পানি ঝরবে; বাস্তবেই এমনটি হলে তো তাঁর পক্ষে চলাফেরা করাই দুঃসাধ্য হবে;- এর অর্থ হচ্ছে- দোয়ারত, সিজ্দারত অবস্থায় অবোরে অঞ্চলিন্দু ঝারা;

(৫) নিঃখাসে মারা গেলে তো আর তথাকথিত যুদ্ধ বা বাহাস বিতর্কের দরকার হয় না;- এখানে নিঃখাস অর্থ দোয়া, দোয়ার চ্যালেঞ্জ- মুবাহলা----- ইত্যাদি। যেমন, সাম্প্রতিককালে মসীহ এবং মাহদী(আঃ)-এর চতুর্থ খলীফা (আইঃ)-এর মুবাহলার মোকাবেলায় পাকিস্তানের ডিস্ট্রিক্টের জিয়াউল হক তার সঙ্গী সাথীসহ (যাদের মধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতও ছিলেন) এক

অভাবনীয় বিমান দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে' (১৭-৮-৮৮)। যে বিমান দুর্ঘটনাকে দুনিয়ার পত্র-পত্রিকাসমূহে বলা হয়েছে রহস্যজনক-'Mysterious'; বলা হয়েছে- 'ZIA BLOWN OUT OF THE SKY', এবং রহস্যের কোনও কূল-কিনারা আজও পর্যন্ত কেউ পায়নি, আর পাবেও না। কেননা, এ ছিল এক খোদাইয়ী গব। অবশ্য, খোদার খলীফা শোকবাতা পাঠিয়ে দেন জিয়ার পরিবারের কাছে।

গয়ের আহমদী আলেমদের ‘বিশ্বাস’—এর পরিবর্তন

এক সময় ছিল-

(১) যখন গয়ের আহমদী আলেমরা এই বিশ্বাসটা পোষণ করতেন এবং জোরে শোরে প্রচার করতেন যে, কোরআন করীমে বর্ণিত ‘খাতামানবীস্ন’ কথাটির অর্থ নবীগণের শেষ বা সর্বশেষ নবী। সুতরাং তাঁরা এই দাবীতে অটল ছিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন আল্লাহতায়ালা সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না, তাঁর পরে এই দুনিয়াতে আল্লাহতায়ালা আর কোন নবী প্রেরণ করবেন না।

এর মোকাবেলায় দেখানো হলো যে, হাদীস শরীফে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে ঈসা মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং হযরত খাতামুনবীস্ন (সাঃ) তাঁর উম্মতের মধ্যে অন্ততঃ একজন নবীর আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি সম্বলিত ভবিষ্যত্বাণী কোনক্রমেই রদ হতে পারে না। তাই, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজন নবীর আগমন অনিবার্য এবং অবধারিত। তখন,

(২) ‘তাদের আলেমরা’ বলতে থাকলেন যে, প্রতিশ্রুত এই ঈসা (আঃ) হচ্ছেন বনী ইসরাইলী নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এবং হাদীসে তাঁরই আগমনের ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছে।

তবে, তিনি পূর্বে নবীরপে আগমন করলেও দ্বিতীয়বারে তাঁর আগমন হবে হ্যরত রসুলে করীম (সা:) একজন উচ্চতরপে, নবীরপে নয়। এর জবাবে-

যখন দেখানো হলো যে, ‘সহীহ মুসলিম’ এর হাদীসে আছে— স্বয়ং রসুলে পাক (সা:) উচ্চতরে মধ্যে আগমনকারী সেই প্রতিশ্রূত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ:)কে ‘নবী উল্লাহ’ বলে উল্লেখ করেছেন অন্ততঃ চার বার। তখন তারা বললেন যে, তিনি (আ:) ‘ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকবেন’ বটে, কিন্তু তিনি হবেন মুহাম্মদী শরীয়তের অধীনে ও আওতায়। আহমদী আলেমরা বললেন— এই কথাটার অর্থই তো তিনি একাধারে উচ্চতিও হবেন নবীও হবেন, এককথায় ‘উচ্চতি নবী’ হবেন। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, এটাই হচ্ছে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবী। অর্থাৎ তিনি প্রথমতঃ হ্যরত রসুলে পাক (সা:)-এর একজন উচ্চতি, অতঃপর নবী।

(৩) তারা বলতে থাকলেন-

মির্যা সাহেবের দাবী মিথ্যা। তাঁর মসিলে মসীহ (আ:) হওয়ার দাবীও বানোয়াট। কেননা, উচ্চতরে মধ্যে আগমনকারী ঈসা মসীহ হচ্ছেন স্বয়ং ঈসা মসীহ নাসেরী (আ:)। তিনি মারা যাননি, তাঁকে আকাশে উঠায়ে রাখা হয়েছে। তিনি জিন্দা রয়েছেন এবং কেয়ামতের আগেভাগে আকাশ থেকে দুনিয়াতে নাফিল হবেন। এর বিরুদ্ধে— প্রমাণ করা হলো যে, কোরআন করীমে অতি সুষ্পষ্টভাবে হ্যরত ঈসা নাসেরী (আ:)-এর ওফাতের কথা বলা হয়েছে। তাঁকে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আকাশে উঠায়ে নেওয়ার কথা না আছে কোরআন শরীফে, না হাদীস শরীফে, এমনকি কোন দুর্বল বা জয়ীফ হাদীসেও না। বরং কোরআনের অন্ততঃ ৩০টি আয়াত থেকে প্রমাণ করা যায় যে, হ্যরত ঈসা নাসেরী (আ:)-এর ওফাত (স্বাভাবিক মৃত্যু) হয়েছে।

(৪) অতঃপর বলা শুরু হলো যে,—

ঈসা (আ:) মারা গেলেও আল্লাহ তাঁকে পুনরায় জিন্দা করে পাঠাতে পারবেন, কেননা আল্লাহ সর্বশক্তিমান। এর জবাবে বলা হলো—

আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন যে, তিনি যাঁকে মৃত্যু দান করেন তাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান না। এটা আল্লাহর একটি চিরস্তন নিয়ম বা

সুন্নত। এবং আল্লাহ্ স্থীয় সুন্নতের খেলাফ করেন না, করতে সক্ষম হলেও করেন না, এটাও তাঁর একটা চিরন্তন সুন্নত বা নিয়ম।

তাছাড়া, ‘আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান’— এই কথাটার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ খাম খেয়ালীপনা করেন, খাইতে পারেন, ঘূমাতে পারেন, সন্তান জন্মাদিতে পারেন-----ইত্যাদি।

(৫) এরপরও, তাঁরা জিদের বশে বলতেই থাকলেন যে, না, ঈসা নাসেরীই (আঃ) আসবেন, কেননা হাদীসে আছে ঈসা নাযিল হবেন। এর উত্তরে বলা হলো— এই নাযিল হওয়ার অর্থ তো ‘পুনরাগমন’ নয়, আগমন। অতএব, পুরাতন কোন নবীর ‘পুনরাগমন’ হবে না। একজন ঈসা সৃদশ নবীর ‘আগমন’ হবে, এবং তিনি হবেন এই উম্মতেরই মধ্য থেকে। তদুপরি, পুরাতন কোন নবীর ‘পুনরাগমন’ হলেও তো একজন নবী এলেনই। তাহলে তো, ‘খাতামানবীউন’— এর পরে ‘আর কোনও নবীরই আগমন হবে না’— বলে যে বিশ্বাসটা সেটাতো টিকছেন।

(৬) অতঃপর গয়ের আহ্মদী আলেমদের কেউ কেউ বলতে লাগলেন (এটাই বোধ করি তাঁদের সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ পরিবর্তন) যে, বনী ইসরাইলী নবী হয়রত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)—এর আগমন হয়েছিল হয়রত খাতামুনবীউন (সাঃ)—এর পূর্বে, তাঁর নবুও’ত ছিল আঁহয়রত (সাঃ)—এর পূর্ববর্তী নবুও’ত, সেহেতু তাঁর পুনরাগমনে খতমে নবুও’তের কোন হেরফের হবে না। যেহেতু তিনি আঁহয়রত (সাঃ)—এর পূর্বেই নবুও’ত প্রাণ হয়েছেন, সেহেতু সেই ‘পূর্বে প্রাণ’ নবুও’ত নিয়েই তিনি পুনরাগমন করবেন। কাজেই এতে কিছু এসে যাবে না। এসে যাবে কেবল তখনই যখন আঁহয়রত (সাঃ)—এর পরে কাউকে নতুন করে নবুওত দান করে পাঠানো হবে। কেননা, সেক্ষেত্রে খতমে নবুও’ত টিকবে না, তেক্ষে যাবে। এই কথার জবাবে— তাঁদের কাছে আহ্মদী আলেমদের সনির্বক্ত অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন দয়া করে তাকওয়া ও দোয়ার সহিত সর্বমান্য শুষ্ক হাদীস সম্পর্কে (যা তাঁরা নিজেরাও প্রায়শঃ উদ্ভৃত করে থাকেন) একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে দেখেন যেখানে বলা হয়েছে :

‘আদম যখন কাদামাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল

তখনও আমি খাতামুরবীস্টন ছিলাম।'

অতএব, খাতামুরবীস্টন মুহাম্মদ (সাৎ)-এর পূর্বে কেউ নবুওত প্রাপ্ত হয়েছেন, এই ধারণাটা জুহানী বা আধ্যাত্মিকভাবে বাতিল। আসলে,—

হযরত রসুলে পাক (সাৎ)-এর স্বকীয় মোকাম, মহিমা ও মর্যাদা সম্পর্কিত এই পবিত্র বাণীতে এই আধ্যাত্মিক মহাসত্যই বিধৃত রয়েছে যে, 'আল্লাহতায়ালার নূর' এর প্রকাশে 'মুহাম্মদ'ই (সাৎ) প্রথম, 'মুহাম্মদ'ই (সাৎ) শেষ। তাঁর নবুও'তই নবুও'ত। মুহাম্মদী নবুওত ছাড়া নবুও'ত নাই। তাই হযরত আদম (আৎ) থেকে শুরু করে প্রত্যেক নবীই তাঁরই (সাৎ) পবিত্র ও একমাত্র নবুও'তের আঁশিক ধারক, বাহক ও প্রকাশক। তাঁর পবিত্র ও সর্বোত্তম সত্ত্বার জেসমানী বা দৈহিক বা পার্থিব প্রকাশের পূর্বে জুহানী বা আধ্যাত্মিক প্রকাশের ধারা বা সিলসিলা প্রবাহিত করেন আল্লাহপাক বিভিন্ন পৃত সত্ত্বার মধ্য দিয়ে এবং প্রয়োজনে তাঁর (সাৎ) অন্তর্ধানের পরে ভবিষ্যতেও এই প্রবাহ থাকবে গতিশীল তাঁরই (সাৎ) অফুরন্ত ফয়েজ ও রহমতের কল্যাণে। এজন্যই তো মুহাম্মদী সত্ত্বাই আদি ও অস্ত, এজন্যই তো মুহাম্মদী নবুও'ত একক ও জিন্দা নবুওত, চিরস্তন ও চিরপ্রবহমান। এবং তাঁর সেই চির প্রবাহিত প্রকাশিত আলোর বর্তমান ধারার নাম গোলাম আহ্মদ, যিনি প্রতিষ্ঠিত মসীহ ও মাহুদী (আৎ)। তিনি কত সুন্দরই না জেনেছেন :

'বরতর গুমান ও ওহম ছে আহ্মদ কি শান হ্যায়

যেছকা গোলাম দেখো মসীহজ্ঞামান হ্যায়।' (ইলহামী পঁতিমালা)

'আহ্মদ (সাৎ)-এর মহিমা ও মর্যাদা চিন্তা ও কল্পনার অতীত; তাঁর এক গোলামকেই দেখ সে যামানার মসীহ হয়েছে।'

যুগ-ইমাম ও অন্যান্য সংস্কারক বনাম সমসাময়িক উলেমা

আল্ল কোরআনের শিক্ষানুযায়ী এবং ধর্মের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে,-

(১) ঈশী ধর্ম প্রবর্তনের গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করে এসেছেন চিরদিন আল্লাহর নিয়োজিত নবী-রসূলগণ;

(২) যুগে যুগে ধর্ম সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেছেন ‘মামুর মিনাল্লাহ’- ‘আল্লাহ কর্তক প্রত্যাদেশ প্রাঙ্গ’ যামানার ইমামগণ;

(৩) এরূপ ঘটনা কোন যুগে কখনও ঘটেনি যে, সকল আলেম ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একত্রে জমায়েত হয়ে সমবেত সিদ্ধান্ত নিয়ে ধর্মের সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

(৪) ‘ধর্মে জবরদস্তি নেই’- ধর্মের এই চিরস্তন শিক্ষা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন বাস্তব জীবনে প্রতি যুগের প্রত্যাদিষ্ট ইমাম। তিনি কখনও যুদ্ধ, সন্ত্রাস বা বিশ্বঙ্খলা সৃষ্টির শিক্ষা দেন না।

(৫) যুগ-ইমাম রাজক্ষমতা বা পার্থিব সম্পদ লাভের স্পৃহা দান করতে আসেন না। আসেন মানুষকে পবিত্রতা দান করতে। তিনি ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও মানবসেবা তথা সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের শিক্ষা দিতে আসেন।

(৬) তিনি ধর্মকে পার্থিব কামনা-বাসনার উপরে প্রাধান্য দিতে শিক্ষা দান করেন। তিনি খোদার সাথে মানুষের মিলন ঘটিয়ে থাকেন, ফলে বহু বিভিন্নান্ত তাদের বিভিন্ন নিয়ে, ক্ষমতাবানরা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নিয়ে তাঁর চরণতলে ছুটে আসে। তারা তাঁর অনুসারী হয়ে ধর্মত্যাগ করার পরিবর্তে ধর্মের জন্য সর্ব প্রকারের জুলুম ও নির্যাতন বরদান্ত করে, মৃত্যু বরণ করতেও দ্বিধা করেননা।

(৭) ধর্মের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটেনি যে, কোন প্রত্যাদিষ্ট যুগ-ইমামের বিরোধিতা সমসাময়িক উলেমা করেননি। কখনও এমন্টা হয়নি

যে, তাঁকে কাফের, মূরতাদ, ধর্মত্যাগী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার ফতোয়া জারি করেনি। তাদেরই ধর্মজ্ঞানে তো কাফের বা মূরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

আমরা বিগত চৌদশ' বছরের ইসলামের ইতিহাসের দিকে মাত্র এক বালক তাকালে দেখতে পাই যে,

(১) হিজরী প্রথম শতাব্দীতে-

হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হোসেন (রাঃ)কে ধর্মদোষী বলা হয়, ধর্মচূত বলা হয়, রাষ্ট্রদোষী ও মূরতাদ বলা হয়, এবং তাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ইমাম লিঙ্গাহে ওয়া ইমা ইপাইহে রাজেউন।

(২) হিজরী দ্বিতীয় শতকে-

হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) কে কাফের ও মূরতাদ আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁদের উপরে অকথ্য জুনুম করা হয়। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)কে কাফের ও মূরতাদ বলা হয়, তাঁকে জেলে দেওয়া হয়, বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়; তাঁর পবিত্র লাশ কবর থেকে তুলে ফেলা হয়, তাঁর কবরে একটা কুস্তাকে দাফন করা হয়, সেই কবরের উপরে গণ পারখানা তৈরী করা হয়।

(৩) তৃতীয় শতাব্দীতে-

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ)কে তিনি হাজার আলেম ও মুফতীর সমবেত সিদ্ধান্ত বা ইজমা অনুযায়ী কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়, বুখারা থেকে বহিকৃত করা হয়। তিনি খারতাং-এ শোকে-দুঃখে অবশেষে আল্লাহর করুণার আশ্রয়ে চলে যান।

হযরত আহমদ বিন হাবলকে (রহঃ) জেলে দেওয়া হয়। চারখানা ভারী শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয় এবং ঐ সব লোহার শিকলসহ বাগদাদ পর্যন্ত

পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। তাঁকে রমজানের রোজার দিনে প্রচণ্ড রৌদ্রের
মধ্যে বেদম বেত্রাঘাত করা হয়।

(৪) চতুর্থ শতাব্দীতে-

হ্যরত মনসুর হাস্তাজকে (রহঃ) কুফরীর ফতোয়া দেওয়া হয়। জেলে
দেওয়া হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে হত্যা করা হয়।

হ্যরত ইমাম নেসাঈকে (রহঃ) কাফের ও মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হয়,
তাঁর বিরুক্তে মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারী করা হয়।

(৫) পঞ্চম শতাব্দীতে-

হ্যরত ইমাম গাজালীকে (রহঃ) কাফের ও নান্তিক আখ্যা দেওয়া হয়,
তাঁর লিখিত গ্রন্থাদি পুড়ে ফেলার হকুম দেওয়া হয়। তাঁর অনুসারীদের বিরুক্তে
মৃত্যুর হকুম জারী করা হয়।

হ্যরত ইমাম ইবনে হাজমকে (রহঃ) স্পেনের গভীর অরণ্যে বনবাসে
পাঠিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয়।

(৬) ষষ্ঠ শতকে-

পীরানে পীর দস্তগীর হ্যরত আব্দুল কাদের জিলানীকে (রহঃ) আস্ত্রামা
আবুল ফারহা আব্দুর রহমান জাওসীর নেতৃত্বে সমসাময়িক আলেম ও
মুফতীরা ইজমা বা সমবেত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাফির ও মুরতাদ আখ্যা দেয়।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ইবনে রশদকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যা দেওয়া
হয় এবং তাঁর অমূল্য গ্রন্থাদি পুড়ে ফেলা হয়।

হ্যরত শেখুল আকবর মুইউদ্দীন ইবনুল আরাবীকে (রহঃ) সমসাময়িক
আলেম ও মুফতীরা ইজমার মাধ্যমে কাফের ও মুরতাদ আখ্যা দেয়। হ্যরত
শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীকে জেলে দিয়ে খাসরোধ করে হত্যা করা হয়।

শেখ ফরিদ উদ্দীন আন্তারকে (রহঃ) কাফের আখ্যায়িত করা হয়।

(৭) সপ্তম শতাব্দীতে-

হয়েরত নিজামুদ্দীন আওলীয়াকে (রহঃ) ধর্মত্যাগী আখ্যা দেওয়া হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে জেলে দেওয়া হয় এবং জেলেই হত্যা করা হয়। হয়েরত শামস-ই-তাবরীজ (রহঃ)-এর জীবন্ত অবস্থায় গায়ের চামড়া তুলে ফেলা হয়।

প্রথ্যাত সুফী কবি মওলানা জালালুদ্দীন রশীকে মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হয়।

(৮) অষ্টম শতকে-

ইমাম ইবনে কাইয়ুমকে জেলে দেওয়া হয়, জুলুম করা হয়।

(৯) নবম শতকে-

মওলানা আবদুর রহমান জামীকে কাফের আখ্যা দেওয়া হয়।

(১০) দশম শতকে-

মওলানা আহমদ বিহারীকে দিল্লীতে হত্যা করা হয়। সুফী সাধক বায়েজীদ সারহাদীকে মুরতাদ বলা হয়, জুলুম করা হয়।

(১১) একাদশ শতাব্দীতে-

মুজান্দিদ আলফে সানী হয়েরত সৈয়দ আহমদ সরহিনকে (রঃ) কুফরী ফতোয়া দেওয়া হয়, জেলে দেওয়া হয়।

(১২) দ্বাদশ শতাব্দীতে-

মুজান্দিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীকে (রঃ) ফাসী ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ করার অপরাধে হত্যার বড়্যন্ত করা হয়। উল্লেখ্য, তিনিই প্রথম কোরআন করীমের অনুবাদ করেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবকে কুফরী ফতোয়া দেওয়া হয়; এখনও আলেমদের অনেকেই ওয়াহাবীদেরকে কাফের মনে করেন, যদিও তারাও এখন সউদী ওয়াহাবীদের টাকার বদৌলতে আহমদীদের বিরুদ্ধে আলোলন করে ও জুলুম চালায়।

(১৩) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে-

বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাসেম
নান্তুবীকে (রহঃ) কাফের আখ্যা দেওয়া হয়, এই কারণে যে, তিনি অভিমত
দান করেন যে, হ্যরত রসূলে আকরাম (সা:)—এর পরে তাঁর শরীয়তের পূর্ণ
আনুগত্য ও আওতায় কেন্দ্র নবীর আগমন হলে হজুর (সা:)—এর খত্মে
নবুও'তের কোন তারতম্য হবেনা।

(১৪) চতুর্দশ শতাব্দীতে—

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদকে, তাঁর মসীহ ও মাহদী (আ:) হওয়ার
দাবী ঘোষণার পর, কাফের, মুরতাদ, দাঙ্গাল-----ইত্যাদি আখ্যা
দেওয়া হয়, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া
জামাতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ফতোয়া দান, জুলুম-নির্যাতন চলে আসছে
এবং চলছে এখনও.....।

বিশ্ব—ইসলামে বিশ্ব—আন্দোলন

অনেকেই হয়তবা প্রশ্ন তুলবেন যে, হ্যরত মির্যা সাহেব তো দুনিয়াতে
এলেন, চলেও গেলেন দুনিয়া ছেড়ে, কই ইসলামের বিশ্ববিজয় তো সম্পূর্ণ
হলো না?

এই প্রশ্নটার অন্তর্বালে যদিও সহজ সুখের প্রত্যাশা এবং কল্পনা—
বিলাসিতাই অনেকাংশে কার্যকর, তবু প্রশ্নটা বিবেচনার দাবী রাখে। কেননা,
কোরআনে করীমে ঘোষণা করা আছে :

**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ يُبَيِّنُهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِ وَ تَوْكِيدُ
الشُّرُكُونَ ①**

“তিনিই তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ যেন একে
সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত করে দেন, মুশর্রেকগণ যত অস্তুষ্টই হউক না
কেন।”(৬১-১০)

এই আয়াতে ‘আলাদীনে কুল্লেহি’ বলতে সকল ধর্ম, ধর্মত ও অন্যান্য মতবাদের উপরে ইসলামের বিজয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই বিজয় তো সহজে এবং স্বল্প সময়ে সম্ভবপ্র নয়। ইসলামের সেই সারিক বিজয়ের জন্য তো শত শত বর্ষব্যাপী নিরলস সংগ্রামের প্রয়োজন। ধর্মীয় এই বিজয় তো আলেকজান্ড্রার বা হালাকুর মৃশংস অন্তর্ভুক্ত-বিজয় নয়, আজকের ইহুদী-চক্রান্তের সত্যঘাতী বিজয় নয়। এই ধর্মীয় বিজয় তো মিথ্যার উপরে সত্যের বিজয়; অন্ধকারের উপরে আলোকের বিজয়, কুসংস্কার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে মুক্তচেতনা ও সত্যতার বিজয়; এবং সর্বোপরি অশাস্তির উপরে শাস্তির বিজয়। এই বিজয় বিশ্বব্যাপী, এই বিজয় তো সহসাই একজনের জীবনকালে সম্পূর্ণ হতে পারেন।

আমরা বলে এসেছি যে, কৌরআন করীমে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে ক্রুশীয় ধর্মত বা ত্রিত্বাদের বিরুদ্ধে। আমরা জানি— এ যুগের যাবতীয় নাস্তি, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যবাদী দর্শন ও চিন্তা-চেতনার জননী হচ্ছে ঐ ক্রুশীয় বিশ্বাস। যে দর্শন ও চিন্তা-চেতনা আল্লাহর অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেছে, ধর্মকে লোকের কল্পিত বিষয় বা লৌকিক বলেছে, আল্লাহকে এক লৌকিক বা কল্পিত সন্তা বলে উপহাস করেছে, অঙ্গীকার করেছে; সেই দর্শন-ক্রুশীয় বিশ্বাস প্রসূত সেই দর্শন, বর্তমানে মানবচিত্তের আসমান থেকে তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে এই জন্য যে, ক্রুশ ভেঙ্গে গেছে। অতঃপর আল্লাহ এবং তোহিদের সত্যসূর্যের উজ্জ্বল আলো মানবাত্মার দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত অন্ধকার অপসৃত করে প্রসারিত হচ্ছে। কল্যাণময় সত্যতা ও সংস্কৃতি ধীর ও দৃঢ় অভ্যর্থনাশূরু হয়েছে মানবজীবনের পথে ও প্রান্তরে। আগামী শতাব্দীতে বিশ্বাস অবশ্যই ইসলামের শাস্তির পতাকাতলে সমবেত হবে। ইসলামের এই বিশ্ববিজয়ের জন্য একদিকে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন ও একনিষ্ঠ সুদীর্ঘ সংগ্রামের; অপরদিকে আত্মশুন্ধির ও আত্মত্যাগের।

আল্লাহর পথে এইরূপ বৃহত্তর জেহাদের ডাক দেওয়া হয়েছে, বিজয়ের ঘোষণা সম্বলিত উল্লিখিত ঐ আয়াতের পরেই। আল্লাহ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ شُجِينَكُمْ قَنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ^(১)
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُبْلِهِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(২) يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُذْخِلُكُمْ
 جَنَّتٍ تَجْرِيْنَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَمَنْكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتٍ
 عَدِيْنَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ^(৩) وَأُخْرَى تُجْبَوْنَهَا نَصْرًا مِنْ
 اللَّهِ وَقُنْبَعٌ قِرْبَيْبٌ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ^(৪)

“হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আঘাত থেকে রক্ষা করবে? (উহা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। (ফলে) তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবিষ্ট করবেন এমন জামাতসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জামাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সফলতা। (এছাড়া) আরও কিছু রয়েছে যা তোমরা ভালবাস- সেটা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; সুতরাং মো’মেমনগণকে সুসংবাদ দাও।

(৬১ : ১১-১৪)

উল্লিখিত আয়াত ক’টির প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করুন, দেখতে পাবেন- ইসলামের বিশ্ববিজয়ের পথে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন

কত বেশী। কোরআনের তফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে প্রতিশ্রূত এই বিজয় সম্পর্ক হবে প্রতিশ্রূত মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফলে। মহাবিজয়ের অগ্রযাত্রা আরম্ভ হবে তাঁরই যামানায়। যে যামানায় বিপুলভাবে প্রসার লাভ করবে ব্যবসায়-বাণিজ্য। মানুষের পার্থিব সুখ ও স্বার্থ চিন্তাই প্রবল হয়ে দেখা দিবে। কিন্তু তখনই এক কল্যাগকর বাণিজ্যের প্রতি ডাক দিয়েছেন আল্লাহ, যে বাণিজ্য সমকালীন যন্ত্রগাদায়ক আয়াব থেকেও রক্ষা করবে মানুষকে। লক্ষ্যণীয় যে, এখানে মুমিনদেরকে ‘হে যারা ঈমান এনেছ’ বলে সংশোধন করেও পুনরায় ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপরে ঈমান আনার’ জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। মুমিনের এই ঈমান দোহৃতানো বা রিনিউ করার দায়িত্ব সম্পাদিত হবে প্রতিশ্রূত মসীহ (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনার মাধ্যমে। ঈমানের নবায়নের ফলে, আল্লাহর ক্ষমা লাভ হবে— পুরুষার লাভ হবে।

অতঃপর

‘নাসারুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহন করীব’-

আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়— এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যে বিজয়ের জন্য আল্লাহর পথে এক তেজারতি বা বাণিজ্যের ডাক দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। যে বাণিজ্যের মূলধন মুমিনের জান ও মালের কোরবানী, এবং যার মূনাফা আল্লাহর সন্তুষ্টি। সূতরাং, যারা সহজে এবং সহসাই ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের আশা পোষণ করেন, তাঁদেরকে কোরআনের এই আয়াতসমূহের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করার জন্য আবারও অনুরোধ করছি।

প্রতিশ্রূত মসীহ ও মাহ্নী (আঃ) বলেছেন :

“ইসলামের নবজীবন লাভ আমাদের নিকট এক কোরবানী চায়। সেটা কি? এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যু—এই কোরবানীর উপরেই ইসলামের জীবন, মুসলমানের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমার বিকাশ নির্ভর করে। ইহাই সেই জিনিস অন্য কথায় যার নাম—ইসলাম।” (ফুর্তহু ইসলাম)।

বিশ্বর্ধ ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের জন্য প্রয়োজন এক বিশ্ব-আন্দোলনের। এই বিজয় রাষ্ট্রশক্তির নয়, অঙ্গের নয়,— এ বিজয় আধ্যাত্মিকতার। অতএব, বিজয়ের সেই আন্দোলনও হবে আধ্যাত্মিক আন্দোলন। যে আন্দোলন দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আল্লাহর ওয়াক্তে জানের ও মালের কোরবানী করে করে অবিচলভাবে এগিয়ে চলবে আল্লাহর পথে। আল্লাহ জাল্লা শান্তুর অশেষ রহমত যে, ইসলামের সেই মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যামানার ফসীহ ও মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। যে পবিত্র আন্দোলনের নাম আহমদীয়া আন্দোলন। ‘ইমাম’ যার ইসলামের বর্তমান খলিফা। যাঁর ঐশ্ব নেতৃত্বের অধীনে, ইসলামের বিশ্ববিজয়ের লক্ষ্য, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে প্রতিদিন প্রতিঘটায় অগ্রসর হচ্ছে আজ বিশ্ব-জামাতে আহমদীয়া। তবু কি তারা বলবে যে, তারাই বিজয়ী হবে? প্রসার্যমান এই দুর্নিবার বাস্তবতাকে লক্ষ্য করেই বিশ্ববিদ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আরনব্দ জে টয়েনবীও বলেছেন যে, এ পৃথিবীর আগামী সভ্যতার সভ্যত্ব এক স্থপতি ইসলামের আহমদীয়া আন্দোলন। (দ্বঃ:- এ স্টাডি অব হিস্ট্রী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৮)।

ইসলামের বর্তমান খেলাফত

পরিশেষে এই প্রশ্ন করা হবে যে,— জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যিনি তিনিই কি বর্তমানে ইসলামের খলিফা? তাঁর খেলাফত কি ইসলামী খেলাফত?

এক কথায় এর দ্যুর্ঘাত জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ— অবশ্যই, হ্যাঁ।

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, সূরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাকে বলা আছে যে, আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে ‘সৎকর্মশীল’ মুমিনদের মধ্যে (তাদের সংখ্যা স্বল্পই হোক আর বেশী হোক) খেলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখবার অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহর এই সুম্পষ্ট অঙ্গীকার পূর্ণ হয়নি বলে যাঁরা মনে করেন,

তাঁরা প্রকারান্তরে এটাই কবুল করেন যে, আল্লাহ্ অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। নাউজুবিল্লাহ্, তা হতে পারেন। আর তাই, ওয়াদামাফিক আল্লাহ্ তাঁর খলিফা খাড়া করেছেন সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য; তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁথিরীতে। তবে তা কোথায় এবং কিভাবে? সেটাই এখন আমরা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ্।

আয়াতে ইস্তেখলাফে প্রদত্ত আল্লাহতায়ালার উক্ত ওয়াদার প্রতি খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমরা নিম্নবর্ণিত হাদীসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

নোমান বিন বশীর হোজায়ফা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন—

“রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

“তোমাদের মধ্যে নবুও’ত ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহতায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুও’তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন; এর পর আল্লাহতায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন জুলুম ও নিপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে এবং তা ততদিন পর্যন্ত কায়েম থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন; এর পর আল্লাহতায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা পরিগত হবে অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে। এবং তা ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন; অতঃপর আল্লাহতায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুও’তের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা:) চুপ হয়ে গেলেন।” – (আহমদ-বাইহাকী : মেশুকাত)

লক্ষ্যণীয় যে, মাত্র এই একটি হাদীসেই বিগত চৌদ্দ শ' বছরের ইসলামী ইতিহাসকে অতি সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে। এবং এই হাদীসের প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যেন, মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলী এই হাদীসেরই বিশারিত ও সম্প্রসারিত বাণ্টবায়ন। মহানবীর (সা:) মহাসত্যতার ঐতিহাসিক প্রমাণ হচ্ছে এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা।

আমরা এই হাদীসে বর্ণিত মাত্র দু'টি বিষয়ের প্রতি আপাততঃ দৃষ্টি নিবন্ধ করতে চাই : প্রথম, শূল হাদীসের একটি কথার; দ্বিতীয়,- বর্ণনাকারীর একটি কথায়। এই হাদীসে হ্যরত রসূলে করীম (সা:) বলেছেন— ‘নবুও’তের পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে নবুও’তের তরিকা অনুযায়ী’— ‘তাকুনু খেলাফাতান আলা মিনহাজিমবুওত’। এই কথা আহ্যরত (সা:) বলেছেন দু’বার— শুরুতে একবার, শেষে একবার। শুরুতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে আহ্যরত (সা:)-এর তিরোধানের পর এবং তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু, শেষে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে কোন নবীর পরে? এই প্রশ্নটার জবাব আমাদের জানতে হবে, উপরকি করতে হবে।

সবাই জানেন যে, হ্যরত রসূলে পাক (সা:) তাঁর উচ্চতের মধ্যে একজন ‘নবীউল্লাহ’র আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যাঁকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন ‘ইসা ইবনে মরিয়ম’ বলে। এবং এই ‘ইসা ইবনে মরিয়ম’ বা প্রতিশ্রূত মসীহ ও মাহ্নী (আঃ)-এর কথা আমরা আলোচনা করে এসেছি। এই প্রতিশ্রূত মসীহ ও মাহ্নী (আঃ) যাঁকে রসূলে পাক (সা:) নিজেই বলেছেন ‘নবীউল্লাহ’— তাঁরই তিরোধানের পর যে খেলাফত কায়েম হবে সেই দিকেই ইঙ্গিত করে আহ্যরত (সা:) বলেছেন, পুনরায় খেলাফত কায়েম হবে নবুও’তের তরিকায়। আল্লাহতায়ালার হাজারো শুকরিয়া যে, আল্লাহ দ্বিতীয়বারের সেই খেলাফতে রাশেদা কায়েম করে একদিকে যেমন তাঁর স্তীয় ওয়াদা বহাল রেখেছেন— পালন করেছেন, অপরদিকে তেমনি তাঁর প্রিয়তম রসূলের (সা:) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে আরও একবার প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের রসূল (সা:) সত্য, সত্য তাঁর মসীহ (আঃ)।

আহ্যরত (সা:)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় প্রতিশ্রূত মসীহ ও মাহ্নীর (আঃ) ওফাতের পর ইসলামী খেলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। ইতোপূর্বে বাদশাহাতের আওতায় যে খেলাফত নামে মাত্র প্রতিহ্যের আকারে চলে আসছিল তারও কার্যকারিতার পরিসমাপ্তি ঘটে তুরস্কের সাল্তানাতের বিপর্যয়ের মধ্যে ১৯০৮/৯ সালেই। এ সম্পর্কিত

ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এটা নয়। তবে, ‘ইসলামের খেলাফত এবং এর গুরুত্ব ও কল্যাণ’ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি অন্যত্র। এখানে এটুকু বলতে চাই যে, যাঁরা মসীহ ও মাহুদী (আঃ) এর এই খেলাফত মানেনি, তাঁরা তুর্কী সালতানাতের পতনের পর খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যে তুমুল আন্দোলন করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে এই কারণে যে, খেলাফত ঐশ্বী সংগঠন- লৌকিক নয়, লোকদের আন্দোলনে খলিফা নিবাচিত হন না। বরং খলিফা খাড়া করেন স্বয়ং খোদা।

হাদীসের শেষে- ‘অতঃপর, পুনরায় নবুও’তের তরিকায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে’- বলেই চুপ হয়ে গেছেন আঁহ্যরত (সাঃ)। আঁহ্জুর (সাঃ)-এর এই চুপ হয়ে যাওয়াটা আকস্মিক বা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে বর্ণনাকারীর কাছে। কেননা, প্রথমবারের খেলাফৎ প্রতিষ্ঠার কথা বলে তিনি (সাঃ) আরও অনেক ঘটনার ইংগিত দিয়ে কথা বলেছেন, অথচ দ্বিতীয়বারে খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলেই চুপ হয়ে গেছেন, আর কিছুই বলেননি। তাই, ব্যাপারটা বর্ণনাকারীর মনে একটা খট্কা সৃষ্টি করেছিল। এজন্যই বর্ণনাকারী বলেছেন- ‘সুস্মা সাক্ষাৎ’- ‘অতঃপর, তিনি চুপ হয়ে গেলেন।’ আশ্চর্য যে, বর্ণনাকারীর এই কথাটিও হাদীসের অংশরূপেই পরিগণিত হয়ে আসছে।

এখানে আঁহ্যরত (সাঃ)-এর এই চুপ হয়ে যাওয়াটাকে আমরা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো : প্রথমবারে অর্থাৎ রসুলে করীম (সাঃ)-এর অব্যবহিত পরে যে খেলাফত কায়েম হয়েছিল তা সহিতভাবে চলে এসেছিল মাত্র তিরিশ বৎসরকাল, যদিও এই সময়ের মধ্যেও নিরাকৃষ্ণ মর্মান্তিক ঘটনাসমূহ ঘটে গেছে। অতঃপর, রাজত্ব---সরাসরি রাজত্ব--- গৃহযুদ্ধ ---সাম্রাজ্যবাদিতা ---- ইত্যাদি ঘটে এসেছে বরাবর। কিন্তু, দ্বিতীয়বারে মসীহ ও মাহুদী (আঃ)-এর পরে যে খেলাফত কায়েম হবে তা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। এ কারণেই, রসুলে পাক (সাঃ) ‘চুপ হয়ে গেছেন।’ এই চুপ হয়ে যাওয়ার তাৎপর্য বুঝতে না পারার কারণেই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে নানা কথা, নানা

গল্প। যেমন, কেউ বলেন,— “চৌদ ছদ্মী হিজরীর পরে যে কী হবে সে কথা তো রসূলুল্লাহ বলেনইনি?” কেউ বা বলেন,— ‘আরে, আধেরী যামানার ৮০ হিজরীর পরে কী যে হবে, সে কথা তো বলেননি হজুর (সাঃ)----- ইত্যাদি।’

বলা প্রয়োজন যে, ইসলামী খেলাফতের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হলো শরীয়তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তা প্রচার করা। প্রথমবারে যেহেতু পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে মহামান্য খলিফাগণকে (রাঃ) শাসনকার্য পরিচালনা করতে হতো, যুদ্ধ-বিগ্রহের দায়িত্ব পালন করতে হতো, সেহেতু অবাস্তু রাজনৈতিক ফেডনা-ফাসাদের মোকাবেলাও করতে হতো। তাই, দুঃখবহ হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মূলত রাজনৈতিক কারণেই খেলাফত টিকে থাকতে পারেনি সেদিন। ত্রিশ বৎসর পরে খেলাফত সত্যিকার অর্থে আর টিকে থাকেনি। ইতিহাস সাক্ষী, এ ব্যাপারে আইয়রত (সাঃ)-এর কথা তাঁর অন্য সকল কথার মতই ফলে গেছে হবহ। কিন্তু, দ্বিতীয়বারের যে ইসলামী খেলাফত তা থাকবে রাষ্ট্রনীতির উর্ধ্বে। এবারে ইসলামের খলিফা থাকবেন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাথার উপরে। এবারে খলিফা এবং তাঁর খেলাফত দায়িত্ব পালন করবেন স্বার্থক এক জাতিসংঘের। একক ইমাম হিসেবে বর্তমান থাকবেন আল্লাহর খলিফা। যে ইমামের নেতৃত্ব মান্যকরা বাধ্যকর হবে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের নেতা বা বাদশাহুর উপর। এবং এভাবেই কায়েম হবে এক বিশ্ব-মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জ। এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পরোক্ষে একটি একক সরকার বা ইউনিটারী গভর্নমেন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে যার সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হবেন খলিফা-এ-গুরান্ত বা সমকালীন খলিফা এবং এই মুসলিম রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদর দণ্ড হবে --কাদিয়ান, ইনশাআল্লাহ।

কেউ হ্যত ভাবতে পারেন না যে, এতে করে তো সেই খৃষ্টান প্যাপাসির অনুরূপ অবস্থার পুনরাবর্তন ঘটবার আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু না, আমরা জানি, তেমন আশঙ্কা ইসলামী খেলাফতে থাকবে না। তার কারণ,-

প্রথম,- এবারে খেলাফত বা খলিফার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন কোন রাষ্ট্র থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ কখনও কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন রাষ্ট্রের শাসনভাব খলিফাকে স্বত্ত্বে নিতে হলেও তা হবে সাময়িক এবং ম্যাণ্ডেটরী শাসনের অনুরূপ।

তৃতীয়তঃ পোপের মত রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না, বিধায় প্যাপাসির মত অবাস্থিত অবস্থার সৃষ্টির কোন আশঙ্কা থাকবে না এই ইসলামী খেলাফতে।

চতুর্থতঃ পোপের পক্ষে টোটালিটারিয়ান বা সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পিছনে কারণ ছিলো এই যে, পোপের জন্য কোন সংবিধান বা শাসনত্ব মান্য করে চলার বাধ্যবাধকতা ছিল না। কাজেই, সে অবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিরঙ্কুশ দুর্নীতিপরায়ণতার 'লায়সা ফেয়ার' বা অবাধ সুযোগ থাকতো। ফলে, পোপের পক্ষে বৈরাচারী হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে, ইসলামী খেলাফতে অনুরূপ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। কারণ, ইসলামের খলিফা, ইসলামী শরীয়ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। শরীয়তের বিন্দুমাত্র খেলাফ কোন কাজ তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই কারণে যে, তিনি খোদাতায়ালার ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে সর্বদা ঝুলন কুদুস বা পবিত্রাত্মার তাঁদে ও নুসরৎ বা সাহায্য ও সহায়তা লাভ করে থাকেন। অতএব, বৈরাচারিতা, দুর্নীতিপরায়ণতা প্রভৃতির কোন অবকাশ নেই ইসলামী খেলাফতে।

পঞ্চমতঃ পোপের ন্যায় অথরিটারিয়ান হয়ে ওঠারও অবকাশ নেই ইসলামের খলিফার। কেননা, শরীয়তের অথরিটির অধীনে ও আয়ত্তে থাকতে তিনি সর্বদাই বাধ্য।

ষষ্ঠতঃ পোপের মনোনয়ন বা নির্বাচন হয় সরাসরি মানুষের দ্বারা। অতএব, প্যাপাসি একটা লৌকিক প্রতিষ্ঠান। পক্ষান্তরে ইসলামের খেলাফত এক ঐশ্বী সংগঠন। এক্ষেত্রে খোদার মনোনীত ব্যক্তিকেই খোদা মুমেনীনের দ্বারা নির্বাচিত করে নেন। এজন্যই বলা হয় যে, খলিফা খোদাই বানায়, মানুষে বানায় না। এখানে গভীর প্রগাঢ়নযোগ্য বিষয় এই যে,— খলিফার সর্বপ্রধান কাজ যেহেতু শরীয়তের যথার্থ পালন ও প্রতিষ্ঠাকরণ, সেহেতু এই কাজ কার

দারা সর্বাধিক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারবে তা জানেন একমাত্র খোদাতায়ালা, তা মানুষে জানে না, তা ফেরেশতাতে জানে না। অতএব, খোদা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ‘খোদার খলিফা’ নির্বাচন করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং, বস্তুনির্ভর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে যদি এ কথা বলা হয় যে, ইসলামী খেলাফত ও খলিফার ক্ষেত্রেও প্যাপাসি ও পোপের শাসনের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, তবে তা হবে অজ্ঞতাপ্রসূত এবং অসমীচীন।

এ প্রসঙ্গে আমরা আর একটি হাদীসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একথা সবাই জানেন যে, হ্যরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহ ইহুদীদের মত হবে। ইহুদীরা ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, মুসলিম উম্মাহ ৭৩ ফির্কায় বিভক্ত হবে। তনোধ্যে ১টি ছাড়া বাকী ৭২টি ফের্কাই থাকবে আগুনের মধ্যে। ঐ যে ১টি ফের্কা সেটি কোনটি? আসহাবে কেরামের (রাঃ) এই প্রশ্নের উত্তরে রসুলে পাক (সাঃ) বলেছিলেন : ‘মা আনা আলাইহে ওয়া আসহাবী’ – ‘যারা আমার ও আমার সাহাবাগণের পথে চলবে তারাই’। এখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) যদি বলতেন – ‘যারা আমার অনুসরণ করবে, তারাই’ – তাহলেই সাহাবাদের প্রশ্নের উত্তর হয়ে যেত। অথচ রসুলে পাক (সাঃ) তাঁর নিজের সাথে সাথে সাহাবাদের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার কথা ও বলেছেন। কিন্তু কেন? এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর রসুল কথনও কোন কথা বলতেন না। এক্ষেত্রেও বলেননি। এবং সেই শুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি হলো, – আঁহ্যরত (সাঃ) – এর পরে সাহাবাগণের মধ্যে যে খেলাফতের ঐশীসংগঠন কায়েম হয়েছিল, সেই খেলাফতের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল আঁহ্যরত (সাঃ) – এর পবিত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উম্মতের ৭৩ ফের্কার মধ্যে মাত্র ১টি ফের্কাই এমন থাকবে, যাদের মধ্যে খেলাফতের জান্মাতী সংগঠন কায়েম থাকবে, এবং বাদবাকী অন্য ৭২টি ফের্কাই থাকবে আগুনের মধ্যে। আজ একথা বলা নিষ্পয়োজন যে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আহমদীয়া ফের্কা ছাড়া অন্য আর কোন ফের্কার মধ্যে খেলাফতের জান্মাতী সংগঠন নেই, খলিফা নেই।

আল্লাহতায়ালার যে আদেশ :

وَاعْتَصُمُوا بِبَيْنَ لِلّهِ حِينَئِذٍ وَلَا تَفَرَّقُوا مِنْ

“এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং
তোমরা পরম্পর বিভক্ত হইও না---’। (৩ : ১০৮)

সেই সাবর্জনীন আদেশের অনুবর্তিতায়-

আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজলে ও রহমতে আহমদী ফের্কার মুসলমানরা
আজ ইসলামী খেলাফতের সেই পবিত্র রজ্জু- ‘আল্লাহর রজ্জু’ - দৃঢ়ভাবে ধারণ
করে আছে; এবং আল্লাহর মনোনীত খলিফার ঐশী নেতৃত্বের অধীনে
ঐক্যবন্ধভাবে ইসলামের খেদমতে জান ও মালের কোরবানী করে যাচ্ছে;
এবং আল্লাহর সাহায্যে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে ইসলামের- প্রতিশ্রূত
বিশ্ববিজয়ের পথে।-----

আমাদের শেষ কথা : ‘আলহামদুলিল্লাহে রাবিল আলামীন।’